

প্রাগ ন্যাশনাল গ্যালারির সদর দপ্তর।

বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

কোনো ভ্রমণ সংস্থার সহায়তা নয়। নিজেরাই স্বাধীনভাবে ঠিক করেছি যাত্রাপথ। প্রথমে রোম ছুঁয়ে প্রাগ। সেখান থেকে মিউনিখ ও বাভারিয়ার প্রকৃতি চাক্ষুষ করে অস্ট্রিয়ান আল্পস দেখতে দেখতে ইতালির তাসকানি আসা। এক অর্থে বলা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে অঞ্চল জুড়ে রেনেসাঁস তথা নবজাগরণ সারা বিশ্বকে আলোড়িত ও আলোকিত করেছিল সেই ভূখণ্ডকে চাক্ষুষ করা এবং একই সাথে সেখানকার ঐতিহাসিক উপাদানের যথাসম্ভব আস্বাদ নেওয়া। ২৮মে, ২০১৭ সকাল সাতটায় উড়ান। তাই লাউঞ্জে নিদ্রাহীন রাত কাটল। পরদিন ঘড়ির কাঁটা ধরে রানওয়েতে দৌড় সেরে পাইলট জানালো For minor fault flight will be delaid. ঘণ্টা দু'য়েক বিমানে বসে ও প্রাতঃরাশ সেরে ফের লাউঞ্জে। আরও দু'ঘণ্টা পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসা বিমানে যখন দিল্লি পৌঁছলাম রোমগামী ফ্লাইট তখন চলে গেছে। বিমানকর্মী জানালো দুটো পথ খোলা আছে। রাতে হোটেলে থেকে পরদিন ভায়া ফ্রাঙ্কফুর্ট দশ ঘণ্টায় রোম, নয়তো দুবাই গিয়ে সেখান থেকে মাঝরাতে এমিরেটস-এর উড়ানে পরদিন এগারোটায় রোমে নামা। ভায়া ফ্রাঙ্কফুর্ট গেলে প্রাগের ফ্লাইট মিস হবে। তাই ভায়া দুবাই যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

দুবাই থেকে রোম যাত্রায় পানীয় হাতে সামনের মনিটরে গ্রেগরি পেগ-আড্রে হেপবার্নের 'রোমান হলিডে' চালু করে ভাবলাম যাক যাত্রায় বাধা কাটল। তখনো বুঝিনি বিড়ম্বনার কিছু বাকি আছে। রোমের ফিউমিসিনো (অধুনা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি) এয়ারপোর্টে নেমে জানলাম প্রাগগামী রায়ান এয়ার সিয়ামপিনো থেকে উড়বে, যে এয়ারপোর্ট চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। টিকিটে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। না জানাটা আমাদেরই অজ্ঞতা। হাতে সময় কম। অগত্যা ট্যাক্সিতে রওনা। বয়স্ক সুদর্শন চালক। ইংরেজি বোঝে। বাইরে সাজানো সুন্দর নিসর্গের দ্রুত সরে যাওয়া।

সিয়ামপিনো খুবই ছোট হাওয়াই আড্ডা। উদ্বেগ, খিদে, ক্লান্তি,

নিদ্রাহীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোমের গ্রীষ্মের উত্তাপ। এ যেন কলকাতাকেও হার মানায়। দু'ঘণ্টার উড়ানে আহারের ব্যবস্থা নেই। মন কোনো ভাবেই তাই সৌন্দর্যভুক হতে নারাজ।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো ইতালির দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে আল্পস। দেশটার তিন দিকেই সমুদ্র। পুবে অ্যাড্রিয়াটিক, পশ্চিমে টাইরেনিয়ান এবং লিওরিয়ান। দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। সেখানে তার নিকট আত্মীয় গ্রিস। 'ইতালি' নামটা গ্রিক ঔপনিবেশিকদেরই দেওয়া। আবার 'গ্রিস' নামটাও দিয়েছে ইতালির মানুষেরা। মাছের লেজের আকারে পেনিনসুলা ইতালি ঢুকে গেছে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে।

বিমান আল্পসের উপরে আসে। দিল্লি-লে পথের মতো বরফশৃঙ্গের সমুদ্র না হলেও বেশ কিছু বরফাবৃত শৃঙ্গের খুব কাছ দিয়ে উড়ে চললাম। অস্ট্রিয়া অতিক্রমের পর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় জার্মানির ডেগেনডর্ফের কাছে ইশার আর ডানিউবের সঙ্গম দৃশ্য। অপরূপ অস্ট্রিয়ার টাইরোল অঞ্চলের নিজস্ব নদী ইশার। রাজকীয় ডানিউবের ইশারায় ক্ষীণকটি ইশার যেন দিশাহারা। এক সময় এসে যায় প্রাগ। যার স্থানীয় নাম প্রাহা। আকাশ থেকে দেখা যায় লাল টালির গৃহশীর্ষের স্কাইলাইন। বলা যায় চেক রিপাবলিকের সাথে আজ আমরা চেকমেট হলাম।

আকারে বা গুরুত্বের বিচারে লন্ডন, পারী বা ফ্রাঙ্কফুর্টের সমগোত্রীয় নয় প্রাগ। বিমানবন্দর থেকে সিটি সেন্টারের দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। গাইডের পাঠানো নির্দেশিকা মেনে কার্ডে ৯০ মিনিট মেয়াদের টিকিট নিয়ে বাস-মেট্রো-ট্রাম সফর শেষে এসে গেলাম মধ্য ইউরোপের সুন্দরতম শহরের কেন্দ্রে। বাসে দেখছিলাম রমণীয় নৈঃশব্দের নিসর্গে আলুলায়িত সবুজ। শহরের প্রাণকেন্দ্রের অন্য রূপ। প্রাগের অভিজাত বৈভব দেখে প্রথমেই তমোনাশকে মনে পড়লো। সে বলেছিল প্রাগকে বাদ দিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ ভাবা যায় না।

পথের দু'ধারে সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের ভবনগুলির নির্মাণশৈলী, প্রাচীনত্ব, অলংকরণ নির্নিমেষে দেখার মতো। দুপুর তিনটে। রোদের তেজ আমাদের চৈত্রমাসকে মনে আনছে। এমন গরম পাবো স্বপ্নে ভাবিনি। তারই মধ্যে দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত গ্রীষ্ম পেয়ে নর-নারী যেন সবাই ঘর ছেড়ে পথে। পরনে শর্টস আর টি-শার্ট। মহিলাদের এক বড়ো অংশের হাতে সিগারেট। পরিচ্ছন্ন ফুট জুড়ে স্থানে স্থানে ওপেন এয়ার পানীয়ের আয়োজন।

ভলটোভা রিভারের পূর্ব ও পশ্চিম জুড়ে প্রাগ। পশ্চিমে প্রাচীন শহর, পর্যটন দ্রষ্টব্যের সিংহভাগ সেখানে। পূর্বাঞ্চল আধুনিক। এই দিকে চার্চিল স্কোয়ার ছাড়িয়ে ছোট্ট স্টেডিয়াম ঘেঁসা নির্জন পাথর বিছানো পথ সোজা মিশেছে এক চিত্তাকর্ষক চার্চের সিঁড়িতে। এই পথের ওপর আমাদের আস্তানা, হস্টেল পেনশন ১৫। অতি প্রাচীন ভবনটিতে অ্যান্টিক ছাপ সর্বত্র।

সূর্যাস্তের পরে পরেই গাইড তার গাড়ি নিয়ে হাজির। ছ'ফুট দীর্ঘ সুদর্শন সাতাশ বছর বয়সি লুকাসকে আবিষ্কার করেছি গুগল সার্চ করে। ওরই ছকে দেওয়া পরিকল্পনা মতো আজ সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। আমাদের সল্টলেকের মতো প্রসারণশীল অঞ্চলের এক নবনির্মিত আবাসনের এক তলায় আমাদের দু'জনের জন্য অপেক্ষারত লুকাসের মা, স্ত্রী ও দিদি। দিদির কোলে তার বছর চারেকের কন্যা, আর স্ত্রীর কোলে লুকাসের দু'বছরের কন্যা। ঘরভর্তি বই ও সেই সঙ্গে দেওয়াল জোড়া মডার্ন আর্টের পেন্টিঙের সমাবেশ। লুকাস জানালো ওগুলো তার ঠাকুর্দার আঁকা। স্ট্যালিনের আমলে চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি।

কুকিস, নুড্‌ল স্যুপ, বেকন, ঘরে বানানো বিশেষ চেক ডেলিকেসি ডাকলিঙ্ক সহযোগে ডিনার সেরে ঘরে ফেরা গেল। দু'জনেরই তখন প্রয়োজন নিটোল ঘুমের।

> Prague is not just a city but an entity of some kind.
>
> – Sezin Koehler



সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা ব্রেকফাস্ট আওয়ার। খাদ্য সম্ভারে এলাহি আয়োজন। দেখভালের দায়িত্বে দুই সুন্দরী চেক প্রৌঢ়া। ব্রাউন ব্রেড, স্লাইস্‌ড ব্রেড, বান, ক্রিশেন্টো কী নেই? জ্যাম, বাটার, চিজ, হনি, পি-নাট ক্রিম, কর্নফ্লেক, দুধ, পর্ক ও বিফের মিক্সড সসেজ। দু'রকমের ফ্রুট জ্যুস, কফি, টি সব কিছু মজুত। ইচ্ছে মতো খাও। এহেন প্রাতঃরাশ সহ থাকা খরচ দৈনিক মাথাপিছু ১১০০ টাকা।

দশটায় লুকাস হাজির। ওর সঙ্গে পায়ে হেঁটে আমরা আজ প্রাগ আবিষ্কার করবো। ঘুম থেকে উঠেই কাছের পার্কে মর্নিংওয়াক সেরে এসেছি। সযত্নে সাজানো সবুজ উদ্যান। পোষ্যকে সঙ্গী করে চেক প্রৌঢ়। ইউরোপের অন্য সব শহরের মতো সারমেয়প্রেমী মানুষ প্রাগেও কম নয়। চার্চিল স্কোয়ারে লাঠিতে ভর দিয়ে হেলে দাঁড়ানো উইনস্টন চার্চিলের মূর্তি। বেশ ক'বছর আগে লন্ডনে ওয়েস্ট মিনস্টার লাগোয়া পার্লামেন্ট স্কোয়ারে চার্চিলের এমন মূর্তি দেখেছি।

কেবল চার্চিল স্কোয়ার কেন, শহরের আনাচে কানাচে নানা ধরনের ভাস্কর্য। গুণমানে বিষয় বৈচিত্র্যে প্রত্যেকেই যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কোন মাত্রায় সৌন্দর্যবোধ কাজ করলে এমনভাবে শহরকে সাজানো যায়। রাস্তার ডিভাইডার শেষ হয়েছে এক ফোয়ারা ঘেরা বৃত্তে। তার চার প্রান্তে চারটি মানবমূর্তি। এরা কেউ বেহালা বাদনরত, কেউ বাঁশি। কারো হাতে অন্য তারবাদ্য। চীনের একাধিক অতি আধুনিক চোখ ধাঁধানো শহরের কোথাও কোন ভাস্কর্য চোখে পড়েনি। ঢাকায় তো মূর্তি নির্মাণ প্রায় নিষিদ্ধ। প্রাগ শহরের সৌন্দর্যায়ন দেখলে নিজের শহরের দৈন্য চোখে পড়ে। নবনির্মিত চিৎপুর লকগেট ফ্লাইওভার যেখানে বি. টি. রোডে মিশেছে সেখানে কোন ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য বা নিদেনপক্ষে আর্ট কলেজের ছাত্রদের কোনো চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি শোভাবর্ধন করতে পারতো। তার পরিবর্তে নিত্য দর্শন করতে হয় খোলা প্রক্ষালনে পুরুষদের পশ্চাদদেশ। কলকাতাকে লন্ডন করার ইচ্ছে কার না হয়? কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য বোধ হয় বয়স লাগে। প্রাগের ক্ষেত্রে বুদ্ধি মুক্তির শুরু সেই ত্রয়োদশ শতকে।

বিভিন্ন ট্যুরিস্ট লিটারেচারে প্রাগকে নানা ভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। কেউ বলে Walking distance Prague. কারো বর্ণনায় Prague is a small magical city. আবার কারো মতে প্রাগ হলো Romantic Hollywood fairy tale. প্রখ্যাত হলিউড অভিনেতা ও পরিচালক অ্যালান লেভি লিখেছেন, 'আমি শুধু মৃত্যুর আগে প্রাগ শহরকে আর একবার দেখবার স্বপ্ন দেখতাম। আমার জীবনের আশ্চর্য ঘটনা হলো, একবিংশ শতকের প্রতিটি সকালে আমি জেগে উঠি প্রাগ শহরে।'

লুকাসকে অনুসরণ করে আমরা পুরনো প্রাগে প্রবেশের জন্য পাউডার টাওয়ারের সামনে এসে থামলাম। গথিক স্থাপত্যে নির্মিত এটি পাউডার গেট নামেও পরিচিত। শহরের তেরোটি প্রবেশ দ্বারের অন্যতম প্রধান দ্বার এটি ১৪৭৫ সালে নির্মিত। অতীতে রাজ অভিষেকের শোভাযাত্রা এই তোরণদ্বার দিয়ে ক্যাসেল অভিমুখে যেত। সপ্তদশ শতকে এটি বারুদ রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার কারণেই এমন নাম।

পাউডার গেটের লাগোয়া প্রাগ নগরপালিকার সদর দপ্তর। অপূর্ব তার নির্মাণশৈলী যে কোনো পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। অনুষন্ধিৎসু ভ্রমণকারী পাউডার গেটের ১৪৫ ফুট ওপরে উঠে প্রাগ দর্শন করতে পারে।

এসে গেলাম শহরের প্রাণকেন্দ্র চালর্স স্কোয়ারে। প্রাগবাসীর প্রধান মিলনক্ষেত্র এই রেন্ডেভুকে কেন্দ্র করে নগর জীবন আবর্তিত হয়। প্রশস্ত পাথর বিছানো অঞ্চলটি ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। একপ্রান্তে স্ট্রিট মিউজিসিয়ানরা বাদনরত। এদের সকলেই প্রবীণ নাগরিক। চেলো, বেস গিটার ও বেশ কিছু স্থানীয় তারের যন্ত্রানুষঙ্গে গান গাইছে জনৈক প্রৌঢ়। এদের ঘিরে পর্যটকের জটলা। সর্বত্র এক কার্নিভালের ছোঁয়া।

স্কোয়ারের উত্তরপ্রান্তে রাজকীয় মর্যাদায় দাঁড়িয়ে বিখ্যাত জোড়া স্পায়ারের চার্চ। নাম, চার্চ অফ আওয়ার লেডি বিফোর টাইন।

চার্লস ব্রিজ থেকে প্রাগ ক্যাসের দৃশ্য।

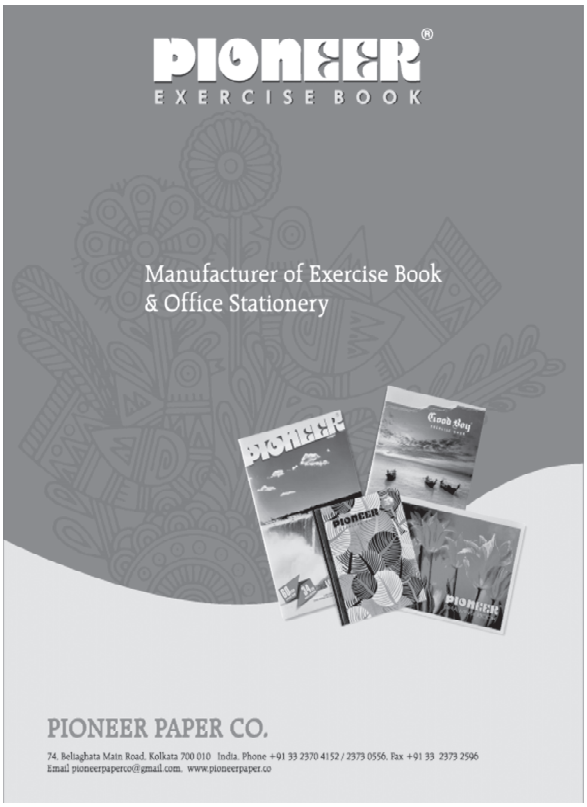


যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

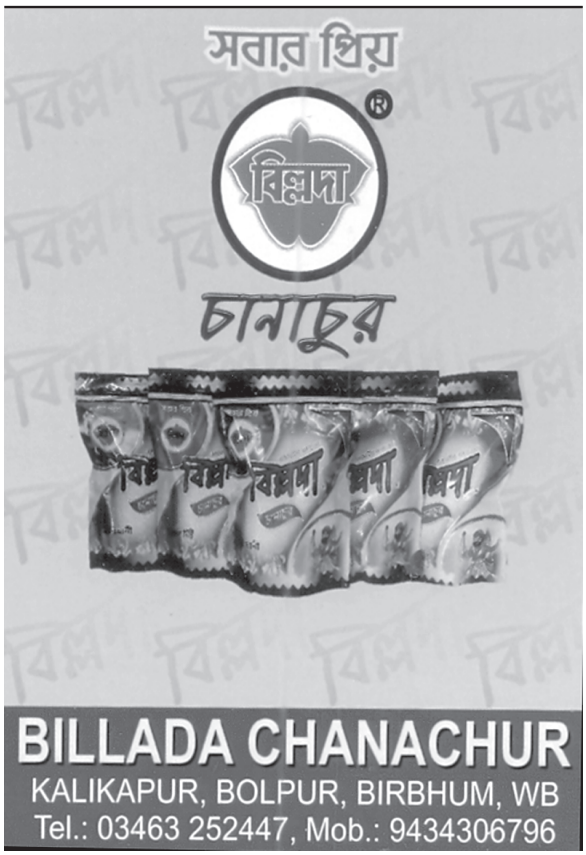
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫





বোহেমিয়ান প্যারাডাইস, প্রকৃতি নিজেই যেখানে শিল্পী।

৮০ মিটার উঁচু এই রোমানেস্ক চার্চটি ১২৫৬ সালে গথিক ছোঁয়া পায়। অতি সূক্ষ্ম অভ্যন্তরভাগে সিলিং থেকে শুরু করে সর্বত্র অমূল্য পেইন্টিং। এই চার্চের অভ্যন্তরে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের (১৫৪৬-১৬০১) সমাধি। ড্যানিশ এই মহাবিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ প্রথম সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহাবর্তনের ধারণা থেকে ক্যাসিওপিয়ার নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার ও মহাকাশ বীক্ষণের নানান যন্ত্রই কেবল উদ্ভাবন করেননি, ছাত্র কেপলারকে এনে এই শহরকে বিজ্ঞান তীর্থে পরিণত করেছিলেন। ইউরোপের রেনেসাঁসের মূলে বড়ো অবদান ছিল সে যুগে প্রাগের লোকেদের শিক্ষাদীক্ষা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। বুঝতে অসুবিধা হয় না আইনস্টাইন কেন এই প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ও পাহাড়ে ঘেরা অতিমনোরম শহরটির প্রেমে পড়েছিলেন। পাকা জহুরির মতো এ শহরও আইনস্টাইনকে চিনতে ভুল করেনি। ১৯১০-এ ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম প্রাগে থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

চার্চের সামনেই এক অসাধারণ ভাস্কর্য যার মধ্যমণি হয়ে দণ্ডায়মান চেক প্রজাতন্ত্রের পরমপূজ্য ব্যক্তিত্ব জন হুশ (১৩৬৯-১৪১৫)। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি একাধারে পুরোহিত, দার্শনিক, শিক্ষক এবং প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও রেকটর পদ অলংকৃত করেছিলেন। কবে কোন মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ক্রান্তিকালে তাঁর প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগ কেবল বোহেমিয়া নয় সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে।

মধ্যযুগে রোমান পাপাল শাসনের স্থলন, বিজ্ঞান বিরোধী অবস্থান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই মহাপুরুষটি মার্টিন লুথার, কেলভিন প্রমুখের একশো বছর আগে চার্চ রিফর্মেশন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফলে পোপের রোষানলে পড়তে সময় লাগেনি। এই স্থানে জীবন্ত পুড়িয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। বধ্যভূমিতে নতজানু হয়ে দু'হাত তুলে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করলে ঘাতকরা তাঁকে নগ্ন করে দু'হাত পিছন দিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে শুকনো কাঠ ও ঘাসের স্তূপে স্থাপন করে। অগ্নিসংযোগ মুহূর্তে কাউন্ট প্যালেটাইনের উপস্থিতিতে মার্শাল ভন প্যাপেল হেইন হুশকে ক্ষমাভিক্ষা করে নিজেকে বাঁচাতে বললে হুশ বলেন, God is my witness that the things changed against me, I never preached. In the same truth of the Gospel which I have written, taught and preached drawing upon the sayings and positions of the holy doctors, I am ready to die today.

কথিত আছে ঘাতকেরা অগ্নি প্রজ্বলনের উদ্দেশে ঠিক মতো জ্বালানি জড়ো করতে না পারলে কোনো এক মহিলা নাকি কিছু শুকনো পাতা সরবরাহ করে তাদের সাহায্য করে। তা দেখে মৃত্যুপথযাত্রী হুশ বলেছিলেন, Sancta simplicitas, চেক ভাষায় যা, Svata Prostota, ইংরেজিতে যার অর্থ Holy simplicity. আজও মানবতা বিরোধী কোনো নিষ্ঠুর কর্মে কোনো নির্বোধের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই বাগধারাটি প্রাগে চালু। মৃত্যুর

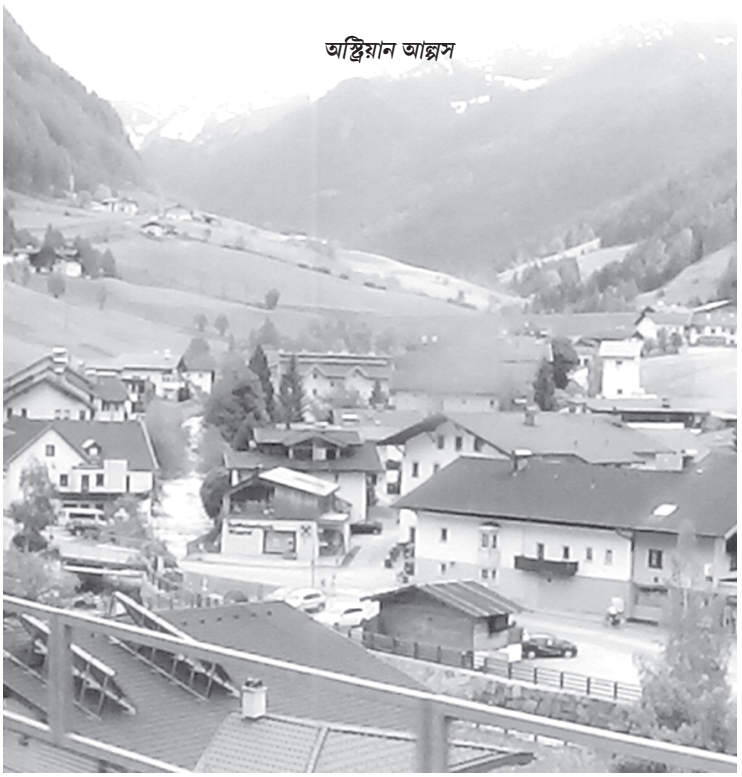
আগে হুশের শেষ উক্তি ছিল, Christ, Son of living God, Have mercy on us. এই মহামানবের মৃত্যুর পর হুশাইটরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ক্যাথলিক ক্রুশেডে তিনবার পোপকে পরাস্ত করে। সেই সময় জান জিজকার (১৩৬০-১৪২৪) নেতৃত্বে বোহেমিয়া এক শক্তিশালী পোপ বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়।

একটা ভাস্কর্য একটি জাতির ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। এই মহাত্মাকে আত্মস্থ করে চেক সত্যিই আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। রোমান ও অস্ট্রিয়ান শাসনে দীর্ঘকাল থেকে এই বোহেমিয়-মোরাভিয় ভূমিতে যে পলি সঞ্চিত হয়েছে তারই ফল তরুণ চেকভূমির সন্তানেরা। হুশ বা জিজকা থেকে ফ্রয়েড, কাফকা, কুন্দেরা, ডুবচেক, নাভ্রাতিলোভা। দেশটা ছোট হলেও তালিকাটা নেহাত ছোট নয়।

প্রাগের ওল্ড টাউন স্কোয়ারে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে নিজেকে যখন হুশাইট ভাবতে শুরু করেছি তখনই লুকাস টাউন হলের দক্ষিণ দেওয়ালে টাঙানো ওরলজের সামনে এনে দাঁড় করালো। সকলেরই দৃষ্টি ঊর্ধমুখী 'ওরলজ', অর্থাৎ গ্রেট অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্লকের দিকে। কোন অতীতে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রাগবাসীকে সময় সচেতন করে চলেছে এই ঘড়ি। নিজের শহর কলকাতায় জি.পি.ও.-র ঘড়ি থেকে বিগবেন কম ঘড়ি দেখলাম না কিন্তু ওরলজ যেন আরও কিছু। কাদান আর সিনদেল নামের চালর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার দুই অধ্যাপক এটির নির্মাতা। কালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো 'ওরলজ' অবস্থান করছে। দেখেছে অনেক, এমনকী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পার্শ্ববর্তী ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাময়িক চলা থামলেও পুনরায় সচল হয়েছে ১৯৪৮-এ। চন্দ্র সূর্যের অবস্থান, রাশিচক্রের স্থান বদল থেকে শুরু করে বাবিলনীয়, মধ্যযুগীয়, খ্রিস্টীয় নানা ধরনের সময় জানাচ্ছে এই ঘড়ি। প্রতি ঘণ্টায় পুতুল মোরগের ডাক ও ঘণ্টাধ্বনির সাথে ঘড়ির তলায় রাখা কাঠের জানালা খুলে গেলে খ্রিস্টের শিষ্যদের পৌত্তলিক মূর্তি বামদিক থেকে একের পর এক দক্ষিণে যায়। যায় মৃত্যুর চিহ্নবাহী একটি নরকঙ্কাল মূর্তিও।

বায়রন বলেছেন, যতদিন কলোসিয়াম ততদিন রোম। তেমনি প্রতিটি প্রাগবাসী বিশ্বাস করে যতদিন 'ওরলজ' ততদিন প্রাগ। দুপুর বারোটায় অসংখ্য পর্যটকের মধ্যে দাঁড়িয়ে চলমান পুতুলের সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম সত্যি সময় এক মহার্ঘ বস্তু। অতীত সেখানে ইতিহাস, ভবিষ্যৎ রহস্য, আজকের দিনটাই উপহার তথা Gift. তাইতো তার অন্য নাম Present. আজকের এই ৩০ মে, ২০১৭ দিনটি আমার কাছে আক্ষরিক ভাবেই পরমপ্রাপ্তি হয়ে থাকলো।

পায়ে পায়ে চলে আসি পারিজস্কা স্ট্রিটে। দু'ধারে কারুকার্য ও চিত্রের সাহায্যে সাজানো প্রাচীন ভবন, আধুনিক রেস্তোঁরা, বিলাসবহুল বিপণী প্যারিসকে মনে পড়ায়। এই শহর সুলভ ও



অস্ট্রিয়ান আল্পস

স্বাদু বিয়ারের জন্য ইউরোপে বিখ্যাত। মিউনিখের পরেই নাকি তার স্থান। কয়েক কদম আসতেই মধ্যযুগের স্পর্শ। অতি প্রাচীন ইহুদি নগরীতে ঢুকে পড়ি।

লুকাস ওল্ড-নিউ সিনাগগের সামনে দাঁড় করিয়ে জানায় অষ্টম শতকে ইউরোপে প্রাচীনতম ইহুদি গোষ্ঠী এখানে গড়ে উঠেছিল। এটি ইউরোপের প্রাচীনতম ও একই সাথে ধারাবাহিক ভাবে উপাসিত সিনাগগ। অভ্যন্তর ভাগের ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশ এক শুদ্ধ সমাহিত অনুভূতির সৃষ্টি করে। পাশেই ইহুদি সমাধিক্ষেত্র। পাঁচিলে ঘেরা এই ক্ষুদ্র স্থানটি তাদের কষ্টকর দমন পীড়নের স্মৃতি বহন করে চলেছে। পাশেই স্প্যানিশ সিনাগগের কারুকার্য স্তম্ভিত করে দেয়। এই শহর পিনকাস সিনাগগে ধরে রেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের ওপরে নেমে আসা দানবীয় নিষ্ঠুরতার স্মৃতিকে। যে অংশে নাৎসী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প হয় বর্তমানে সেটা মিউজিয়াম। এ শহরে একলক্ষ কুড়ি হাজার ইহুদির সংখ্যা ১৯৪৫-এ মাত্র পনেরো হাজারে নেমে আসে। এখানে আটাত্তর হাজার স্থানীয় ইহুদির জন্মমৃত্যুর তারিখ ও পারিবারিক নাম সযত্নে পাথরের দেওয়ালে লেখা।

চেকদের এই পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের করুণ কাহিনি ও



মানবেতিহাসের এক ঘনকৃষ্ণ অধ্যায়কে ধরে রেখেছে টেরেজিন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। প্রাগ থেকে এক ঘণ্টার দূরত্ব। একটা শান্ত নির্জন গ্রাম, যেখানে একলক্ষ চল্লিশ হাজার ইহুদি নর-নারী, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে গেস্টাপো বন্দিশালায় রাখা হয়েছিল। যাদের মধ্যে ৩৩ হাজারের মৃত্যু হয়েছিল। এদের অনেকেরই অন্তিম গতি হয়েছিল ট্রেবলিঙ্ক, আউসভিস্ট-এর মতো গ্যাসচেম্বারগুলিতে। যেটা অবাক হওয়ার তা হল তার মধ্যেও ওইসব নর-নারী তাদের ভয়াবহতাকে অস্বীকার করেও ধর্মীয় উৎকর্ষ ও সৃষ্টিশীলতা বজায় রেখেছিল। দুঃখের বিষয়, সময়গতভাবে প্রতিবন্ধী থাকায় টেরেজিন আমাদের অদেখা থেকে গেল।

১৩৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইউরোপের প্রাচীনতম চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়, যার অন্য নাম ইউনিভার্সিটি ক্যারোলিনা দেখে আমরা Lesser Town -এ চলে এলাম নদীর পশ্চিম প্রান্তে।

গির্জাকে কেন্দ্র করে একসময় এ শহরে যে শিল্প সৃষ্টির প্লাবন ঘটেছিল তা ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ক্যাথিড্রালে চার্চে। বারোক স্টাইলের অন্যতম সেরা দৃষ্টান্ত স্ট্রহোভ মনাস্টারি ও তার উপাসনালয় যখন অবাক করছে তখন গোল্ডেন লেনের সেন্ট ভিটাস ক্যাথিড্রাল যেন মনে মনে বলছে, 'ওরে পাগল আমাকে এখনো দেখিসনি।' এসব দেখলে বোঝা যায় কেন প্রাগকে City of hundred spires বলে। প্রাগের এই Lesser Town, Castle Town হিসেবেও পরিচিত। স্ট্রহোভের সৃষ্টি কবে কোন ১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৮৭ তে মোজার্ট এখানে অর্গান বাজিয়েছিলেন। পাশেই প্রাগ লোরেটো। তার Holy House of Our Lady এটিও বোহেমিয়ান বারোক শিল্প রীতির এক অনবদ্য রত্ন বিশেষ।

হাজার দর্শনার্থীর মধ্যে ঝাঁকি দর্শনের বেশি কিছুই হচ্ছে না। দেখতে দেখতে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে একসময় কখন এসে গেছি প্রাগ ক্যাসেলের মধ্যে। গিনিস বুক অফ রেকর্ড জানাচ্ছে সমুদ্র তল থেকে ১৮৭০ ফিট উঁচুতে সাড়ে সাতলক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে গড়া এই ক্যাসেলটি নাকি বিশ্বের বৃহত্তম প্রাচীন ক্যাসেল। বছরে এই ক্যাসেল প্রায় কুড়ি লক্ষ পর্যটক আকর্ষণ করে। ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এর পত্তন চার্চ অফ ভার্জিন মেরী দিয়ে। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে সেন্ট জর্জ, সেন্ট ভিটাসের মত ব্যাসিলিকাগুলো।

প্রাগ ক্যাসেলের অন্তর্গত সেন্ট ভিটাস ক্যাথিড্রালকে বিশ্বের সেরা তিনটি ক্যাথিড্রালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গত এক হাজার বছরে যত রকম স্থাপত্য রীতির সৃষ্টি হয়েছে সবগুলোই এখানে ব্যবহৃত। এখানকার বারগ্রেভ প্যালেস প্রাঙ্গণে প্রতিবছর সামার শেক্সপিয়র ফেস্টিভাল হয়। বর্তমানে এই প্রাসাদ চেক রাষ্ট্রপতির বাসস্থান। বাকিংহামের মতো এখানকার প্রহরী বদল দর্শনীয়। ক্যাসেল প্রাঙ্গণ থেকে সমগ্র প্রাগ নগরীর এক চিত্তাকর্ষক বিহঙ্গ দৃশ্য ধরা দেয়।

পায়ে পায়ে এসে যাই প্রাগের Exotic sounding name চার্লস ব্রিজে। কতো কাব্য, কতো বর্ণনা এই সুপ্রাচীন চতুর্দশ শতকের স্টোন ব্রীজকে নিয়ে। আধ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি ৯০ ফুট চওড়া। পুরোটাই পাথর বিছানো। তলায় বয়ে চলেছে টলটলে ভলটোভা।

একটা ব্রিজকে ঘিরে এমন ভালোবাসা বিশ্বে বিরল। হবে নাই বা কেন। সাত সাতটি শতাব্দী ধরে এই ঐতিহাসিক নগরীর দুই প্রান্তের সংযোগকারী এই সেতু প্রাগ নগরীর আইকনিক সিম্বল। কেবল এঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেলই শুধু নয়, এই সেতুকে ঘিরে প্রাগবাসীর আবেগ সুবিদিত। সেতুতে যানবাহন নিষিদ্ধ। পর্যটকের ঢল নেমেছে। সেতুর দু'ধারে পনেরোটি করে ত্রিশটি অসাধারণ মূর্তি। প্রতিটির কেবল ঐতিহাসিক মূল্যই নয় স্থাপত্য শৈলীও অসামান্য। এর বেশিরভাগই বারোক শিল্পরীতির নিদর্শন। বেশির ভাগই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। সেন্ট বার্নাডের কাছে সমর্পিতা ম্যাডোনা, যীশুর ক্রুসিফিকশন, সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি, সেন্ট ক্রিস্টোফার বা সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারদের মতো মূর্তিগুলো কাকে ছেড়ে কাকে দেখি। বেশ বোঝা যাচ্ছে অপরাহ্নের ক্লান্তিতে আর যাই হোক

চার্লস ব্রীজ দর্শন করা উচিত নয়। কুয়াশা ঢাকা নির্জন শীতের সকালে চার্লস ব্রিজকে পাওয়া এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এই সেতু দর্শনের সেরা সময় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মুহূর্তে।

টাউন হল ছেড়ে কাফকা মিউজিয়মের সামনে স্থির হই। দ্য ট্রায়াল, দ্য মেটামোরফোসিস, ইন দ্য পেনাল কোডের মতো উপন্যাস ও অসংখ্য কালজয়ী ছোট গল্পের স্রষ্টা এই চেক ইহুদি লেখককে কে না জানে। কাম্যু, ফুঁকোর সাথে এক সারিতে রাখা এই স্বল্পায়ু (১৮৮৩-১৯২৪) লেখক Alienation তত্ত্বের অন্যতম জনক। লিখেছেন জার্মান ভাষায়। আমস্ট্রার্ডামের ভ্যানগগ মিউজিয়ামের মতো লেখকের এই জন্মস্থানেও গড়ে উঠেছে কাফকা মিউজিয়াম।

সঙ্গী রাজীবের আই ফোন জানিয়ে দিচ্ছে সকাল থেকে এই পর্যন্ত বারো কিলোমিটারে কতগুলো স্টেপ ফেলেছি আমরা। লুকাস আমাদের ভিটকভ পার্ক দেখিয়ে ঘরে ফেরাতে চায়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দ্রষ্টব্য দর্শনের নেশায় ক্ষুধাবোধ কমে যায়। কিন্তু ক্লান্তি, সংক্ষিপ্ত সময়ে সবকিছু দেখার তাগিদ জনিত এক অস্বস্তি শরীরে বাসা বাঁধে। আমার অবস্থা ঠিক তেমন। তাই মুজতবা আলিকে স্মরণ করে স্ট্রিট কাফেতে বসে ফ্রায়েড চিজ স্যান্ডুইচ সহ বিয়ারের অর্ডার দিলাম।

ঘড়িতে ছটা বাজে। রোদ দেখে মনে হচ্ছে দুপুর দুটো। এই সময় এখানে প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা রোদ থাকে। লম্বা দিনের আলো থাকায় ভ্রমণের চাহিদাও স্বভাবতই বাড়ে।

ভিটকফ পার্ক শহরের প্রান্তে অনুচ্চ এক পাহাড় শীর্ষে বিশাল সবুজের সমারোহে বানানো। পার্কের এক প্রান্তে জাতীয় স্মারক বানানো হয়েছে। সেখানে বিশাল অশ্বারোহী জান জিজকার মূর্তি। এটি নাকি বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ব্রোঞ্জ মূর্তি।

পাহাড়ি সবুজের পারিপার্শ্ব ছেড়ে পায়ে পায়ে এসে গেলাম দিনের শেষ দ্রষ্টব্য জিজকভ টিভি টাওয়ারের সামনে। জিজকভ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এই নামকরণ। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯২ এর মধ্যে নির্মিত এই টাওয়ারটি হাই-টেক আর্কিটেকচারের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মহাকাশ যান সদৃশ এই ২১৬ মিটার উঁচু সৃষ্টিটির তিন কোণ থেকে তিনটি কলাম উঠে গেছে। তার একটি অন্য দুটির প্রায় দ্বিগুণ। এই কলামগুলো স্টীলের পাতের মধ্যে কংক্রিট দিয়ে নির্মিত। এই টাওয়ারের ৬৬ মিটার উচ্চতায় ১৮০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্টুরেন্ট আছে। সত্তর মিটার উচ্চতায় আছে হোটেল এবং ৯৩ মিটার উঁচুতে আছে অবসারভেটরি।

জিজকভ টাওয়ারকে দেখে সাংহাইয়ে হুয়াংপু নদী তীরে ওরিয়েন্টাল পার্ল রেডিও টিভি টাওয়ারের কথা মনে আসে। সেখানেও কলোসাল হাইটে রেস্টুরেন্ট আছে। সাংহাই টাওয়ারের তুলনায় জিজকভ উচ্চতায় অর্ধেকের কিছু কম, কিন্তু সৌন্দর্যে খাটো নয়।

যেটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার তা হল এই উজ্জ্বল রুপোলি ধাতব কলামগুলোর গায়ে বেশ কিছু হামাগুড়ি দেওয়া শিশুর মূর্তি আটকানো। অনেকেই উঠছে, কেউ বা নামছে। ফলে শিল্পকর্মটি যান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের মধ্যেও পেয়েছে এক মানবিক ছোঁয়া।

জিজকভও নির্মাণকালে আইফেলের মত এক শ্রেণীর মানুষের কাছে কম সমালোচিত হয়নি। আইফেল বিরোধী মোপাসা বা এমিল জোলার মতো জিজকভের ক্ষেত্রেও অনেকেই এর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায়নি। কমিউনিস্ট শাসনকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে না পারলেও চেকোশ্লোভাকিয়ার তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান তথা কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্টের নামানুসারে জিজকভ টাওয়ারকে জ্যাকস্ ফিংগার বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। এই সব সমালোচকদের অন্য যুক্তি ছিল শতাব্দী প্রাচীন ইহুদি সমাধি ক্ষেত্রের একাংশ ধ্বংস করে নাকি এই টাওয়ার বানানো হয়েছে। যুক্তি যাই হোক টাওয়ারটি আমার মতো অতি সাধারণ পর্যটককে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে সে কথা বলতে বাধা নেই।

> Prague, the city so beautiful that it was spared by Hitler
>
> – World of Wanderlust

ইউরোপে Culturally best preserved city -তে আজ তৃতীয় দিন। আজ আমাদের লক্ষ্য বোহেমিয়ান প্যারাডাইস। সারাদিন ট্রেকিং-এ কাটবে। হিমালয়ের দেশের মানুষ আক্ষরিক ভাবেই আজ বোহেমিয়ান। আভিধানিক অর্থে বোহেমিয়ার অধিবাসীকে বোহেমিয়ান বলে। যে অর্থে লুকাস বোহেমিয়ান। এছাড়া শিল্পে নিবেদিত প্রাণ আপনভোলা মানুষকেও বোহেমিয়ান বলা হয়। যেমন ভ্যানগগ, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ। সৃষ্টিছাড়া প্রতিভাবানরাই বোহেমিয়ান হতে পারে। কিন্তু ডাচ কারেজ, কৃপণ স্কচদের মতো বোহেমিয়ার সঙ্গে বাউন্ডুলের যোগ কেন কে জানে।

নিজের গাড়ি নিয়ে লুকাস হাজির। প্রাগ থেকে ৯০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এই স্বর্গের অবস্থান। স্থানীয় লোকজনের কাছে 'চেশকি রাজ' নামে এটি পরিচিত। একঘণ্টা যাত্রাপথে চেক গ্রামাঞ্চল দেখার সুযোগ মেলে। স্টিয়ারিং-এ বসে কথায় কথায় লুকাস জানায় এখানে নাকি কেউ গাড়িতে হর্ণ বাজায় না। যদি হর্ন বাজে তাহলে বুঝতে হবে ভুল করে আঙুল হর্নের নবে পড়ে গেছে। বোঝা যায় বিশ্বে হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে চেক রিপাবলিক কেন ছ'নম্বরে। লুকাস ইন্ডিয়ার খবর রাখলেও অমিতাভ বচ্চনের নাম শোনেনি।

এসে গেলাম চেশকি রাজের দ্বারপ্রান্তে। একটা মাত্র কাঠের সাজানো কটেজ। এখান থেকে টিকিট কেটে গাড়ি পার্কিং করে শুরু হল পায়ে হেঁটে স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙা। প্রথমে অনেকটা সমতল অরণ্য। আমাদের ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনার মতো। ম্যাপল,

বার্চ, ওক ও নানা অচেনা গাছের সমাবেশ। সাদা বড়ো বড়ো বুনো ফুল ফুটে আছে। তেমন কোনো পাখি চোখে পড়ছে না। জনমানবহীন অরণ্যে আমরাই একমাত্র পর্যটক। লুকাস জানায় আমাদের মতো ট্রেকিং করে চেশকি রাজ দর্শনে তেমন ট্যুরিস্ট ও বড়ো একটা পায় না।

কাল রাতে এখানে ঝড়বৃষ্টিতে কিছু গাছ পড়েছে তাই সরাতে ট্রাক্টর নিয়ে এসেছে কর্তৃপক্ষ। অরণ্য তেমন ঘন নয়। তবে পাইনের সমাবেশ নজর কাড়ে। এক সময় শুরু হল পাথরের রাজত্ব। বিশাল বিশাল নানা মাপের পাথরের ফাঁক দিয়ে উঠে আসা গেল অনেকটা ওপরে। দূরে সবুজ সমতল কৃষিক্ষেত, বাগিচা, গ্রাম কুমায়ুন হিমালয়ে সামলাতাল পূর্ণাগিরি থেকে যেমন দৃশ্য ধরা দেয় অনেকটা তেমন।

দেখা হলো একদল স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর সাথে। মোরাভিয়া অঞ্চল থেকে ওরা এসেছে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর প্রত্যেকে। আমাদের পেয়ে বেজায় খুশি। এক সঙ্গে ছবি তুললাম। অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়া।

ধীরে ধীরে চেশকি রাজ যেন তার আসল রূপ প্রকাশ করছে। পাথুরে পথ এতটাই পরিচ্ছন্ন যেন মনে হয় এইমাত্র কেউ ঝাড়ু দিয়ে গেছে। তার অন্যতম কারণ জঙ্গলে মৌসুমী ভারতবর্ষের মতো গোরু, মোষ, কুকুর, ছাগল, শেয়াল, ভাম প্রভৃতির অনুপস্থিতি। ফ্লোরা ফনায় আমাদের তুলনায় কম সমৃদ্ধ এই বোহেমীয় অরণ্যাঞ্চল। গায়ে গায়ে প্রায় জুড়ে থাকা সুউচ্চ পাথরের ফাঁকে ঠিক একজন মানুষ যেতে পারে এমন অসংখ্য গলিপথ যা Labyrinth নামে পরিচিত। রহস্যঘন বিচিত্র প্রস্তর গবাক্ষ বলা যায়।

অনেকটা উঠে আসার পর হঠাৎ যেন সকল দৃশ্য এক নিমেষে বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে হারিয়ে গেল। চোখের সামনে ধরা দিল অসংখ্য পাথরের অবস্থান। যেমন রহস্যজনক তাদের গঠন তেমন বিস্ময়কর



ওরলজ, হ্রেট ত্যাস্ত্রোনমিক্যাল ক্লক

সমাবেশ। যতদূর দৃষ্টি চলে ঘন পাইনের কালচে সবুজে ঘেরা অসংখ্য পাথরের অবস্থান। কোনটার আকার যেন কোনারকের মন্দির, কোনটা বা রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অবিকল যেন শিশু কোলে জননী। প্রকৃতি নিজেই যেন তার শিল্পসত্তা প্রমাণে মরিয়া।

মনে মনে নিজেরাই নিজেদের ডেস্টিনেশন নির্বাচনকে বাহবা দিই। কতো দিন ধরে প্রকৃতি নিজের খেয়ালে বৃষ্টিপাত বাতাস, শীতলতা, ভূমিক্ষয় ও পরবর্তীকালে আগ্নেয়গিরিকে মোকাবিলা করে এই ভূতাত্ত্বিক শিল্পকলা রচনা করেছে। শতশত বছর ধরে এই বোহেমীয় স্বর্গ তার অপার্থিব সৌন্দর্যের ছটায় আকর্ষণ করে চলেছে চিত্রকর, লেখক, শিল্পী, স্বপ্নসন্ধানীকে। চেশকি রাজ যেন চেক জেম স্টোনের এক প্রাকৃতিক অনন্য সংগ্রহশালা। এক রূপকথার দেশ। ১৯৫৫ সালে এই প্রকৃতি উদ্যানটি ইউনেস্কো চিহ্নিত ক্ষেত্রের মর্যাদা পায়। বর্তমানে এর আয়তন ৭০০ বর্গ কিলোমিটার মতো।

পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে মাটির পথের চৌমাথায় এক কাঠের বেঞ্চে বসি। লুকাস বাড়ি থেকে এনেছে সকলের জন্য ব্রেড আর কলা। বোহেমিয়ান লাঞ্চ এই শব্দবন্ধের বাস্তব রূপায়ণ। তিনদিকে ওক আর ম্যাপল গাছকে সঙ্গী করে পায়ে চলা পথ চলে গেছে এই বোহেমিয়ার খণ্ড খণ্ড স্বর্গে।

এমনই একটা পথ ধরে এগিয়ে চলি তিনজন। ভারতের ডুয়ার্স, শ্রীলঙ্কার সিংহরাজ বা চেক রিপাবলিকের চেশকিরাজ যাই হোক না কেন জঙ্গলে পায়ে হাঁটার আনন্দই আলাদা। টলটলে জলের সরোবর, কোনো পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ, সুসজ্জিত কোনো সংগ্রহশালা কিংবা বেশ কিছু রাজপুরুষের ক্যাসেলে সাজানো এই সংরক্ষিত অরণ্য। এমনই এক ক্যাসেলে এসে উপস্থিত হলাম। ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে অনাড়ম্বর কিন্তু আভিজাত্যের চিহ্ন ক্যাসেলটির সর্বাঙ্গে। ভদ্রাসনে গৃহস্থ নেই, আছে মোটা দক্ষিণায় প্রবেশ ব্যবস্থা। তাই ইচ্ছে হল না ঢোকার।

> Prague never lets you go... this dear little mother has sharp claws.
>
> – Franz Kafka

প্রাগকে বিদায় জানাতে কষ্ট হচ্ছে। যদি কোনো একটি কারণে এ শহরকে ভালো লেগে থাকে সেটা হতে পারে এখানকার নাগরিক আবহাওয়ার মধ্যেও একধরনের নির্জনতার স্বাদ। আমাদের দেশে যেটা গ্যাংটক বা শিলঙে পাওয়া যায়।

সেন্ট্রাল বাস স্টেশন থেকে দশটার ইউরোলাইন বাসের টিকিট সঙ্গে নিয়েই কলকাতা ছেড়েছি। বাসে ওয়াইফাই, টয়লেট, স্বয়ংক্রিয় কফি বিয়ারের কিয়স্ক কী নেই। ছুটে চলল তাপ নিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত



যান। বোহেমিয়ার চেক রিপাবলিক ছেড়ে কখন বাভারিয়ার জার্মানিতে ঢুকলাম বোঝা গেল না। বাইরে চোখ জুড়োনো প্রকৃতি।

এই বাসযাত্রা আমাদের মতো সময়ের দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী ভ্রমণকারীকে বেশ কয়েকটি দ্রষ্টব্য দেখিয়ে দিল। সারি সারি লুফ্‌থানসার বিমান সমেত মিউনিখ বিমানবন্দর ছাড়াবার পর এসে গেল সার্কাস তাঁবুর মতো জালের নকসায় বানানো আলিম্পিক স্টেডিয়াম। সেই সঙ্গে দূরে চোখে পড়ল টিভি টাওয়ার। সব শেষে বি.এম.ডব্লু মোটর সংস্থার দৃষ্টিনন্দন প্রধান কার্যালয়ের ভবন। এটি ভিয়েনার বিখ্যাত এক আর্কিটেক্টের বানানো। মিউনিখ নাকি 'ব-চতুষ্টয়ের' জন্য বিখ্যাত। এগুলি হল বিল্ডিং, বি.এম.ডব্লু, বেয়ার্ন মিউনিখ আর বিয়ার। তার মধ্যে প্রথম দুটির প্রমাণ চলন্ত বাস থেকেই পাওয়া গেল। অবশেষে সাড়ে তিন ঘণ্টার যাত্রা শেষ হল দেখার মতো নকসায় নির্মিত মিউনিখ সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে।



মোরাভিয়ান ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বোহেমিয়ান প্যারাডাইসের জঙ্গলে।

পাশেই ব্যস্ত রেল স্টেশন।

বাভারিয়া প্রদেশের রাজধানী মিউনিখের সঙ্গে হিটলারের জীবনযুদ্ধ নানা ভাবে জড়িয়ে আছে। ভিয়েনায় পেন্টিং স্কুল অ্যাকাডেমিতে ভর্তির পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কিশোর হিটলার এই মিউনিখে এসে পথে পথে নিজের আঁকা ছবি বেচে রোজগার করতো। এই শহরেই তার সেনাবাহিনীতে যোগদান ও নাৎসি দলের জন্ম। মিউনিখের শোভায় মুগ্ধ হিটলার তার আত্মজীবনী মাই কেম্ফে লিখেছেন..... One has not seen Germany if one does not know Munich no, above all else one does not know German Art if one has not seen Munich.

এ শহরেও আমরা উঠবো হোটেল পেনশনে। স্টেশন থেকে দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। জনবিরল রাস্তায় সওদাগরি দপ্তর সমৃদ্ধ অঞ্চলে এই হোটেলটি। পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত ভবনটিতে প্রাগের মতো অ্যান্টিক ছোঁয়া নেই, রয়েছে আধুনিকতার বৈভব। মিনি ম্যানিকিওর্ড গার্ডেন লাগোয়া রিসেপশানে ঝুড়ি ভর্তি ওয়েলকাম চকোলেট। আমাদের দেশের যে কোন থ্রি-স্টার হোটেলের সমগোত্রীয় বলা যায় এটিকে।

মিউনিখকে আমরা দিয়েছি মাত্র দু'রাত। তার মধ্যে আগামী কাল কাটবে ১৩০ কিলোমিটার দূরে ফুসেন শহর লাগোয়া নিউসোয়াস্টাইন ক্যাসেল দর্শনে। তাই আজকেই যতটা সম্ভব মিউনিখ দর্শন করতে হবে। সেকথা রিসেপশনের তরুণটিকে জানালে সে গাইডম্যাপ হাতে ধরিয়ে প্রাণপণে তার জার্মান ইংরেজিতে জানালো সিটি সেন্টার ও সেখানকার বিখ্যাত টাউন হল তেমন দূরে নয়। যদি আমরা পায়ে হেঁটে শহর দর্শন করতে চাই তাহলে কেবল মারিয়ান প্লাজ সেন্টারে ওই টাউন হলেই দিনের বাকি সময়টা কাটানো ভালো। জানলাম বেয়ার্ন মিউনিখ স্টেডিয়াম অনেকটাই দূরে। ছেলেটি অভিজ্ঞ ট্যুরিস্ট গাইডের মতো বলল, The character of a city is defined by its gardens. সেই সঙ্গে জানতে চাইলো আমরা কেন ইংলিশ গার্ডেন দেখবো না। ১৭৮৯ সালে ৩৭৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই উদ্যানটি নাকি নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কের (৩৪১ হেক্টর) চেয়েও বড়। মনে মনে ভাবি স্টেশন থেকে আসার পথে টের পেয়েছি এ শহরে চোখ জুড়োনো সবুজের সুপরিকল্পিত সমারোহ। কুড়ি শতাংশেরও বেশি অংশ জুড়ে এখানে খোলা আকাশ।

প্রাগ থেকে এসে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ইউরোপের বৃহত্তম জি.ডি.পি.-র দেশে এসেছি। কেবল অর্থই নয় চিন্তার ঐশ্বর্যের ছোঁয়াও সর্বত্র। জার্মানিতে এটা আমার দ্বিতীয় সফর। আগেরবার ঢুকেছিলাম হল্যান্ড থেকে কোলনে। রাজপথের মাঝে ও দু'ধারে ছায়াদানকারী স্থানীয় মৃত্তিকার একান্ত আপন বৃক্ষ বিন্যাসের মাধ্যমে সৌন্দর্যায়নের চিহ্ন। এসব দেখে মন ভারাক্রান্ত হয় যখন ভাবি বিশ্ববঙ্গ সরণিকে নিঃস্ব করে বেছে নেওয়া হচ্ছে মুখ্যত সেই অনাত্মীয় গাছ যা সৌন্দর্যে খেজুর গাছকেও লজ্জা দেবে। খেজুর গাছের তবু বিউটি না থাক ইউটিলিটি আছে। শীতে কলসি বাঁধা হলে দুর্গা টুনটুনি রসাস্বাদে আকৃষ্ট হয়। মাসকাট, দুবাই প্রভৃতি শহরে যে হাইব্রিড ম্যাকার্থুরি নামের গাছ দিয়ে সৌন্দর্যায়ন হয় সেই গাছ আমাদের সরকারি ভবন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাজপথ সর্বত্র বিদ্যমান। ফল-জ্বালানি-ছায়া কোনোটাই দিতে না পারা এই বন্ধ্যা বৃক্ষ নির্বাচন কার অনুপ্রেরণায় কে জানে।

শহরের প্রাণকেন্দ্র মারিয়ান প্লাজ। প্রাচীন টাউন হলের স্থানে নতুন টাউন হলকে ও সেন্ট পিটার চার্চকে ঘিরে এই চত্বরটি মিউনিখ শহরের প্রাণভোমরা বলা যায়। পনেরো লক্ষ মানুষের শহর মিউনিখে সারা বছর এক কোটি ট্যুরিস্টের আগমন হয়। প্রাগের

চালর্স স্কোয়্যারের সমগোত্রীয় এই মারিয়ান প্লাজ। সৌধটির নির্মাণ ১৮৬৭-তে শুরু ও ১৯০৯-এ শেষ। ব্রাসেলস টাউন হলের অনুকরণে নির্মিত এই গথিক ভবনটি নিঃসন্দেহে গর্ব করার মতো। পাঁচটি স্টিপল সমন্বিত এহেন স্থাপত্য বিরল বলা চলে। চারশোটি কক্ষ সমন্বিত এই বিল্ডিংটিতে শহরের মেয়রের ও বেশ কিছু সরকারি অফিস রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বিখ্যাত ঘড়ি ও তার কুপারর্স ডান্সার্স। প্রাগের গ্রেট অ্যাসট্রোনমিক্যাল ওরলজের মিউনিখ সংস্করণ যেন। এখানেও সকাল এগারোটা, দুপুর বারোটা ও বিকেল পাঁচটায় পুতুলরা নৃত্য প্রদর্শন করে।

এখানে এখন বসন্তকাল। নানান দেশের নর-নারীর জমায়েত ও তাদের কোলাহলকে ছাপিয়ে দূরাগত সমবেত কণ্ঠে পরিচিত সুর ক্রমশ কাছে এল। জনা কয়েক তরুণ-তরুণী খোল-করতাল ও অ্যাকোর্ডিয়ান সহযোগে কৃষ্ণকীর্তনরত। ইসকনের স্থানীয় ভক্তদের কপালে রসকলি, পরনে নির্ভেজাল বাঙালি ধুতি ও শাড়ি। স্বভাবতই সুর এবং নৃত্য সংক্রামিত হয়। মেতে গেলাম ওদের সঙ্গে। একটি ভারতীয় বালক তার বাবা-মায়ের হাত থেকে ছিটকে এসে আমাদের সঙ্গে গলা মেলালো। এ এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। ট্যুরিস্টদের ক্যামেরা, সেলফির সক্রিয়তা জার্মান তন্বীর নৃত্য-গীতে স্মরণীয় হয়ে উঠল মারিয়ান প্লাজের অপরাহ্ন। আমরা ভক্তিবেদান্তর কলকাতা থেকে এসেছি শুনে বেজায় খুশি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা স্থানীয় ভক্তকুল।

এই স্কোয়ারেরই লাগোয়া ভিক্টোরিয়ান মার্কেট। এটা ফার্মার্স মার্কেট নামেও খ্যাত। তাজা ফলের রস থেকে সসেজ কী নেই। সর্বোপরি রয়েছে বিশাল গাছের তলে বেঞ্চপাতা খোলা বিয়ার গার্ডেন। প্রায় শ'পাঁচেক লোকের সমাবেশ সেখানে। কাউন্টারে কল খুলে অবিরাম নানা মাপের মগে বিয়ার ভরে পরিবেশন করছে বিশেষ বাভারিয়ান পোশাকের জার্মান সুন্দরীর দল। অক্টোবরের বিয়ার উৎসবে মিউনিখের এই খালাসিটোলা কী রূপ নেয় অনুমান করা যায়। এই উৎসবময়তা আর কোথায় মিলবে? সসেজ সহ বিয়ার আনতে গিয়ে টের পেলাম এহেন মগ তুলতে গেলে জার্মান কব্জির প্রয়োজন। আমার মতো চা-কফির কাপ তোলা বাঙালি কবজির পক্ষে কাজটা বেশ কঠিন।

বিকেল গড়িয়েছে অনেকক্ষণ। গোধূলির মিউনিখে সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে এহেন আয়োজন ছেড়ে উঠতে মন চায় না। চার দিকে বিত্তবান সুখী মানুষের দল। এই মুহূর্তগুলোতেই মনে হয় জীবন কেবল যাপনীয়ই নয় উপভোগ্যও বটে। জীবনে কখনোই বেহিসেবি হওয়ার সুযোগ পাইনি। হিসেব করে মেপে চলা দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে এসেছি। পরিচিতজনেদের অনেকের কাছেই এটা এক ধরনের রোমাঞ্চ। এই সব ইউরোপিয়ানদের কাছে এটা তাদের জীবনযাপনের অঙ্গ বিশেষ। একটু বেহিসেবি হওয়ার ইচ্ছে হয়। নিয়ে ফেলি আরও একবার ফেনিল বিয়ারের মগ। এবার আমি দার্শনিক হতে বাধ্য। এদেশের বিয়ার কি সত্যি নন অ্যালকোহলিক? পাশে বসে বয়স্ক পানরত জনৈক পর্যটকের সঙ্গে আলাপ হয়। একা এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। এমনই এক সত্তরোর্ধ নিঃসঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হিমালয়ে হর-কি-দুন-এর পথে কলকাত্তাইয়া ধারে।

ঠিকানা নেই আগু পিছুর
কারো সঙ্গে যোগ না কিছুর
ক্ষণকালের ভোজবাজি এই ঠাট্টা।

এই সন্ধ্যা অক্ষয় অমর হলে কী ভালোই না হত। হঠাৎ অন্তরাত্মা বলে উঠল, 'টুপভুজঙ্গ হয়ে যেয়ো না। উঠে পড়ো।' অন্ধকার ঘনানোর পর কোন শহরেই আমরা বেশিক্ষণ বাইরে কাটাই না। ডিনারের আসরে বোঝা গেল খাওয়ার খরচ মিউনিখের তুলনায় প্রাগে অনেক কম।

There's a famous slogan here in Bavarian dilect, and we use it inside Bayern Munich. We say 'Mia San Mia'. It means we are we.

– Bastian Schweinstiger

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে প্রাতঃরাশ সারা গেল। শেষে আকণ্ঠ জার্মান ইয়োগার্ড খেয়ে সোজা স্টেশন। বুকিং কাউন্টারে শুনলাম টিকিটের চাহিদা আছে, কারণ আজ শনিবার। উইক এন্ড শুরু। বুকিং ক্লার্ক টিকিট দিয়ে বলল ইউ উইল গেট চার্মিং সিনারি।

পরিবহণের সুব্যবস্থায় জার্মানীকে ইউরোপের স্বর্গ বলা হয়। পাঁচজনের একটা দল তৈরি করতে পারলে বাসভাড়া অবিশ্বাস্য হারে নাকি কমে যায়। দলে দলে জার্মান যৌবন আজ তাই ঘর ছাড়া। অনেকেরই সঙ্গে সাইকেল। তাতে দু'দিনের আয়োজন ঠাসা। বাকিরা তরুণ তরুণী নির্বিশেষে ব্যাকপ্যাকার। সাইকেল নিয়েই ট্রেনে উঠছে। এরা সাইকেলকে এখনও আত্মার আত্মীয় মর্যাদা দিচ্ছে। এদের যৌবনের এহেন চাঞ্চল্য দেখলে কথাটা সত্যি মনে হতে বাধ্য যে যৌবন এখানেই। এদের মধ্যেই জন্ম নেয় কার্লের মতো তরুণ ও ওয়ান্ডার লুস্ট, ওয়ান্ডার ফোগেল, ইউথ হোস্টেলের মতো মুভমেন্ট।

সিট নম্বর নেই। পছন্দ মতো আসন নিলাম। ঘণ্টা দুয়েক বাভারিয়ান আল্পস দেখতে হবে। মুখোমুখি আসনের মাঝে টেবলে রঙিন রুটম্যাপ। ফলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কোন স্টেশন আসবে, কিংবা কখন অ্যালপাইন লেকের দর্শন পাবো। আধুনিক যুগে নির্মিত রূপকথার ক্যাসেল দর্শনের লক্ষ্যে আপাতত আমাদের গন্তব্য জার্মানির পাহাড়ি শহর ফুশেন।

দু'বছর আগে ১৪ হাজার ফিট উচ্চতায় টিবেটান রেলওয়ের অভিজ্ঞতা টাটকা। সেখানে শীতল মরুভূমি থেকে নমোসো লেকের স্বর্গীয় শোভায় চমকিত হয়েছি। আজ তরঙ্গায়িত সবুজের মাঝে লেকের সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখে পুলকিত হচ্ছি। ভারতেও জম্মু-কাশ্মীরে নবনির্মিত রেলপথে কামরা থেকে ভূস্বর্গ দর্শন করেছি। কেন জানি না মনে হয় এই বাভারিয়া যদি ভোগের ঘরের সুসজ্জিত পাশ্চাত্য সুন্দরী হয়, কাশ্মীর বা তিব্বত যেন অনাদৃতা প্রসাধন-উদাসিনী তন্বী।

ট্রেনের কামরা থেকে আল্পসের খণ্ডিত অংশই কেবল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একেবারে নিখুঁতভাবে সাজানো, যাকে বলে ম্যানিকিয়োর্ড বিউটি। কোথাও এতটুকু আগোছালো নয়। দূরে কালো পাইনের ব্ল্যাকফরেস্ট আরও দূরে অধিক উচ্চতায় বরফে সাজানো শৃঙ্গ। সামনের টেবিলের ছবি জানিয়ে দিচ্ছে দু'পাশে জনহীন ঢেউ খেলানো সবুজের বুক চিরে এই ট্রেনকে কেমন দেখাচ্ছে।

ফুসেন স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মিনিট দশ বাসযাত্রা। দূর থেকেই ধরা দিল ঘন কনিফারের অন্দরে পিকচার পোস্টকার্ডের মত নিউসোয়ানস্টেইন ক্যাসেল। ছোটদের ফেয়ারিটেলে যে ছবির সঙ্গে আমরা পরিচিত হুবহু তার বাস্তবায়ন। জার্মানির এই জনপ্রিয়তম ক্যাসেলটি দেখেই ওয়াল্ট ডিজনি তাঁর ম্যাজিক কিংডম গড়ার প্রেরণা পান। ১৮৬৯ থেকে ১৮৮৬ এই সতেরো বছরে রাজা লুডউইগের হাতে বানানো এই ক্যাসেল। বড়লোকের খেয়ালই বটে। ওয়াগনারের পরম ভক্ত রাজা। নাট্যকারের অন্যতম বিখ্যাত চরিত্র সোয়ান কিং-এর স্মৃতিতে বানিয়েই ফেললেন পাহাড় শীর্ষে এই অসামান্য দুর্গসদৃশ প্রাসাদটি। প্রতিরক্ষার প্রয়োজন কখনোই হয়নি। তবুও বানালেন। চারতলা সৌধের ভিতরে ইন্দ্রের ভুবনের আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। অসমর্থ বা বয়স্ক নর-নারী জোড়া ঘোড়ার কোচে চলেছে। হিমালয়ে অনেকবার এমন চড়াই ভেঙে যাওয়ার অভিজ্ঞতায় নতুন তেমন আকর্ষণ বোধ করছি না। গন্তব্যে পৌঁছে অস্ট্রিয়া ঘেঁষা নিচের হহেনসিউয়ানস্টেইন উপত্যকার দৃশ্য ও দূরের লেকের দৃশ্য ভুটানের ফুন্টসোলিং পাহাড়ের গুম্ফা থেকে তোর্সা ভ্যালির দৃশ্যকে মনে আনে।

পরদিন ইতালির পথে ট্রেন বদল করতে ইন্সব্রুকে কয়েক ঘণ্টা কাটলো। কাচ ঢাকা ট্রেনে গরমে কাহিল হয়ে অস্ট্রিয়ান আল্পস অতিক্রম মোটেই সুখদায়ক নয়। ইউরোপে গরম অবশ্যই বেমানান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ আমরা, তাই ইউরোপে এসে অস্ট্রিয়ান আল্পসে গরমে কষ্ট পাব কল্পনার অতীত।

স্টেশনটা একেবারে আল্পসের কোলে বসানো। পাহাড়ের মাথায় ছাইরঙের বরফের সারি। সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে একটি কাহিনিতে এই শহরের নিখুঁত বর্ণনা আছে। হিটলারের অতিপ্রিয় শৈলশহর সাউন্ড অফ মিউজিক-ধন্য সলজবুর্গের সঙ্গে সুধা ধবলতায় এ শহর প্রতিস্পর্ধী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্টেশনের জৌলুস জানিয়ে দেয় অস্ট্রিয়া কেন ইউরোপের বনেদি শাসক। হাঙ্গেরি, ক্রাকাউ, বোহেমিয়া, বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া তাকে ছেড়ে চলে গেলেও তার ভিয়েনা আছে, আছে ডানিউব। স্টেশনের চেহারা দেখে অনুমান করা যায় লোকারণ্যের পারি, রোম, লন্ডনের তুলনায় এখানকার শহরগুলো ধোঁয়াশা ও কোলাহলকে বিদায় দিয়ে এক অ্যারিস্টোক্র্যাটিক সাইলেন্স সহ রাজকীয় আভিজাত্য বজায় রেখেছে। জ্যুরিখ, জেনেভা, ভিয়েনা, ইন্সব্রুকের মতো শহরে ঝাঁকি দর্শন করা উচিত নয়।

জেনেভা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সঞ্জীবন মহারাজ সময় নিয়ে একা সেখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেও পরিস্থিতিগত বাধ্যবাধকতায় এ যাত্রায় যাওয়া হলো না। ■

With Best Compliments From -

A

Well Wisher



উপন্যাস

অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত



আজ অবধি কোনো হিসাবই মেলাতে পারলাম না। আসলে আমি তো হিসাবটা করতেই জানি না। — বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল মিলন। ঈষৎ যেন চিন্তিত মনে হলো তাকে। মিলনের উল্টোদিকে চেয়ারে মুখোমুখি বুড়ো বসে। বুড়োর মুখে একটা ফিচেল ধরনের হাসি। পুবদিকের জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। একটু আগে জানালায় দুটো শালিক বসেছিল। মিলনের এখন কথা বলার ঘোর লেগেছে। বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল মিলন— জানেন তো, ছোটোবেলা থেকেই অঙ্ক কষতে পারতাম না। ফেল করতাম ক্লাসে। ভয়ে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকতাম। এখনও কেউ হিসাব করতে বললেই আমার ভয় করে। কেমন যেন পেট গুলিয়ে ওঠে। বুকের ভিতর হুম্ হুম্ করে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ— সব গুলিয়ে যায়। কী করি বলুন তো? এটা কি আমার অসুখ? বুড়োর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে মিলন। বুড়োর কোনো ভাবান্তর হয় না। শুধু ফিচেল হাসিটা আরও চওড়া হয়। তাহলে তোমার হিসেব করে কে— বলে বুড়ো, মিলনকে।

— কে আবার? আমার বউ। বউ বড় বকে আমাকে, জানেন। বলে, হিসাব করতে জানো না— লোকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। সারা জীবন কী ঠকবে নাকি! বউটা বকে আমাকে, তবে ভালোও বাসে। দুপুরে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে না খেয়ে বসে থাকে।

— বউ তো হিসাব রাখে, তুমি তাহলে কী কর সারাদিন?

— আমি? আমি তো সকালে ওই বাইক চেপে বেরিয়ে পড়ি। তা যদি বলেন, তো বাইকটারও তো অনেক বয়স হলো। কেমন যেন ঝরঝরে হয়ে গেল। বউ বলে— আমাকেও নাকি ওই বাইকটার মতো দেখতে।

— সাতসকালে বেরিয়ে পড়, তো, যাও কোথায়?

— ঘুরে ঘুরে অর্ডার ধরি। কার বাড়িতে গ্রিল বসবে, কার বাড়িতে গ্রিলে রং হবে এইসব। আমি অর্ডার ধরি, আর বউ দরদাম ঠিক করে। ওই যে বললাম না, আমি তো আসলে হিসাব বুঝি না।

— রোজ কি অর্ডার পাও?

— না, না। রোজ কি আর অর্ডার থাকে? তা ধরুন না, হপ্তায় দু-একটা পেয়ে যাই। আমাদের দুজনের সংসার। ওতেই চলে যায়।

— যখন অর্ডার পাও না, তখন কী কর?

— আসলে রোজ রোজ অর্ডার পেতে তো আমারও ভালো লাগে না। আমি তখন বাইকটা নিয়ে হাইওয়ে ধরে দূরে দূরে চলে যাই। ফাঁকা মাঠ দেখলে, গাছের তলায় বাইকটা রেখে আমিও শুয়ে থাকি চুপচাপ। বললে বিশ্বাস করবেন না বটে, মাটিতে কান পাতলে আমি তখন কতরকম শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় মাটির তলায় ময়দানব আর একটা শহর বানাচ্ছে যেন। আর গাছেরও শব্দ শুনি। আমার কেন জানি ধন্ধ লাগে মাঝেমধ্যে। মনে হয়, গাছও যেন কথা বলতে পারে। সে পারে কী পারে না আপনি বলতে পারবেন ভালো। কত লেখাপড়া করেছেন।

— তারপর?

— তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমোতে ঘুমোতে একসময় ঘুমটা ভেঙে যায়। ধড়মড় করে উঠে পড়ি। তখন বউটার কথা আমার মনে পড়ে। তড়িঘড়ি বাইক চালিয়ে ফিরে আসি। দেখি, বউ ঠিক ভাত সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। এইটুকুই তো আমার জীবন। আমি হিসেব বুঝি না, ঘুরে বেড়াই। আর বউ আমার গ্রিলের কারখানা সামলায়। যাই বলুন, বউ আমার লক্ষ্মীমন্ত কিনা।

এবার বুড়ো একটু প্রাণখোলা হাসে। বলে— তা বটে, তা বটে। এবার একটু চা খাও তো আমি বানাই।

— তা আপনি যদি বলেন, তো খাবো।

বুড়ো ওঠে। ইলেকট্রিক কেটলিতে জল বসায়। দূরে কোথাও একটা ঘুঘু ডাকছে। একটু আগে প্রান্তিক স্টেশন দিয়ে গুমগুম করে একটা মালগাড়ি চলে গেল।

— আপনার বউও লক্ষ্মীমন্ত।

— কী করে বুঝলে— গরম জলে চায়ের পাতা মেশাতে মেশাতে জিজ্ঞেস করে বুড়ো।

— সে বোঝা যায়। বলতে হয় না।

— তা, খুব ভুল বলোনি হে। আমার বউও একটু আধটু লক্ষ্মীমন্ত। আমি থাকব বলে কেমন বাড়িটা সাজিয়ে দিয়ে গেছে দেখেছো তো।

— লক্ষ্মীমন্ত বউ যখন, এখানে আপনি একা একা পড়ে থাকেন কেন?

— নাও চা খাও— মিলনের দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেয় বুড়ো। নিজে চেয়ারের ওপর জমিয়ে বসে। বলে— কেন জানো? আসলে এখানে অন্য কেউ এসে থাকলে গাছেরা আমার সঙ্গে কথা বলে না। ওরা চায়, আমি শুধু ওদের সঙ্গে থাকি। শুধু ওদের সঙ্গেই কথা বলি। না হলে রাগ করে ওরা।

চায়ে চুমুক দেয় বুড়ো। অবাক হয়ে মিলন জিজ্ঞসা করে— তাহলে আপনিও গাছের কথা শুনেছেন? কথা বলেছে ওরা আপনার সঙ্গে?

— হ্যাঁ। বলেছে তো, এখনও বলে। সারাদিন কত কথা বলে ওরা আমার সঙ্গে। সকালে একরকম কথা বলে। বিকেলে একরকম। রাতের দিকে একরকম, আবার গরমকালে একরকম। বর্ষায় একরকম। কত কথা। কত কথা।

— ওহ্, তাহলে আপনিও জানেন, আপনিও জানেন। উত্তেজনায় হাতের চায়ের কাপ টেবিলে রেখে চেঁচিয়ে ওঠে মিলন। বলে— টুকিকে বলতেই হবে। টুকিকে আমি কতবার বলেছি, গাছেরা কথা বলতে পারে। ও বিশ্বাসই করে না আমার কথা।

— এবার আমার নাম করে বলো। বিশ্বাস করবে। কথা বলে বলেই তো ওদের আমি নাম রেখেছি। ওই যে বাড়ির পিছনে শিরিষ গাছটা— ওর নাম রেখেছি হৃদয়। আর সামনের বারান্দায় ডালপালা ছড়িয়েছে যে কৃষ্ণচূড়াটা, ওর নাম রেখেছি রূপকুমার। এদিকে ডালিম গাছটার নাম নবকুমার। আর ফায়ারবলটার নাম চিন্ময়ী। আচ্ছা, তা কী যেন নামটা বলছিলে— টুকি। তা টুকি কে? বউয়ের নাম নাকি?

— না, না। বউয়ের নাম নয়। বউ তো পারুল। টুকি আমোদপুরে থাকে। ভাতের হোটেল চালায়। আমি মাঝে মাঝে বাইক নিয়ে আমোদপুরে চলে যাই। টুকির হোটেল ভাত খাই। ডিমের ঝোল আর ভাত। বড় যত্ন করে খাওয়ায় টুকি। কতদিন বলেছি, টুকি, আমি হিসেব বুঝি না। ঠিকঠাক দাম কি তোকে দিতে পারলাম? টুকি দাম নেয় না। শুধু হাসে। বলে— সবার সব হিসাব বুঝে দরকার কী?

মিলন গলাটা একটু খাদে নামায় এবার। বলে— আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি!

— অনেক কথাই তো বলছ।

— বলছি, আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, টুকি কি আমাকে ভালোবাসে?

— সে আর আমি কী করে বলি বল? আমি তো নিজেই মানুষের মনের তল পাই না। আমি শুধু গাছেদের মন বুঝি।

চুপ করে বসে থাকে মিলন। ধীরে সুস্থে কাপের চা শেষ করে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে— যাক, সকালটা অনেকক্ষণ কাটল আপনার সঙ্গে। এবার যাই। এবার একটু রতনপল্লির দিকে যাব। ওখানে গ্রিলের অর্ডার নিতে হবে। নতুন বাড়ি।

* * *

মিলন চলে যাওয়ার পর বুড়ো পুবদিকের বারান্দায় এসে বসে। এই বারান্দাটা ওর খুব প্রিয়। এখান থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে প্রান্তিক স্টেশনটা দেখা যায়। মাঝে মাঝে মালগাড়ি যায় হুমহুম করে। রাতবিরেতে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ইস্টিশনে। এক্সপ্রেস ট্রেন এসে থামে স্টেশনে। তখন একটু মানুষজনের ভিড়। তা বাদে ফাঁকা। বারান্দার গা ঘেঁষা এই শিরিষ গাছটায় অজস্র টিয়াপাখির বাসা। ভোরের দিকে ওরা হই-হই করে উড়ে যায় আকাশে। বিকেল পড়তে আবার ফিরে আসে। বুড়ো বসে বসে সারাদিন ওদের দেখে। আরও কত পাখি। সেদিন দুটো দোয়েল বারান্দার গ্রিলে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল। আরও একদিন কী একটা নাম না-জানা পাখি। বুকের কাছটা হলদেটে। বুড়ো বারান্দায় বসে থাকে— ওরা এসে খেলে যায় চারদিকে। মোটেই ভয় পায় না বুড়োকে। বুড়োও অবশ্য ওদের ভয় দেখাতে চায় না।

বেশ অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে থাকে বুড়ো। এখন একটু একটু করে তাপ বাড়ছে। কিন্তু বুড়োর বারান্দা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। আজকাল, বুড়ো বুঝতে পারে, তাকে আলসেমিতে ধরছে। কখনো কখনো বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে যায়। কতদিন এমন হয়েছে, চেয়ারে বসে ঘুমিয়েই পড়েছে বুড়ো। তারপর মালগাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙেছে। আজকেও উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

— ও দাদু শুনছ— রাস্তা থেকে রতন ডাকছে। ছেলেটা সারাদিন সাইকেলে টো-টো করে এ পল্লি থেকে ও পল্লি ঘুরে বেড়ায়। নার্সারিতে চাকরি করে। এবার নার্সারি থেকে একটা কাঠচাঁপার চারা এনে দেবে বলেছে। বোলপুরের হলে নতুন হিন্দি সিনেমা এলে সবার আগে লাইন লাগায়।

ডাক শুনে উঠে দাঁড়ায় বুড়ো। বারান্দার গ্রিল ধরে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকায়। সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে রতন। কায়দা করে চুল ছেঁটেছে।

— ও দাদু, সারাদিন তো বাড়িতে বসে। এদিকে খবর শুনেছ নাকি?

— না তো। কী খবর?

— গোয়ালপাড়ার মুখে বুড়ো বটগাছটাকে তো এবার কেটে ফেলবে।

— কে বলেছে তোকে এসব অলুক্ষুণে কথা? একটু আগে মিলন ঘুরে গেল। ও তো বলল না কিছু।

— আরে দূর, মিলন কী জানে। ওর কথা ছাড়ো। আমি তোমাকে একদম ঠিক খবর দিচ্ছি, মাইরি।

— তুই এ খবর জানলি কী করে?

— নিজের চোখে দেখে এলাম যে। রাস্তা চওড়া করবে। তার আগেই গাছটা কাটবে। ঠিকাদারের লোক এসেছে। মাপজোক হচ্ছে গো। কী ভিড় কী ভিড় বুড়ো বটগাছ ঘিরে।

বুড়ো বট কেটে ফেলবে— গোয়ালপাড়ার লোকদের খুব মন খারাপ। যাক গে, আমি নার্সারিতে যাই এখন।

বলেই ঝপ করে সাইকেলে উঠে পড়ে রতন। যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বলে— ওরা তোমার কাছে আসবে বলছিল একবার।

বারান্দার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো। দূরে কোথাও একটা ঘুঘু একটানা ডেকেই যাচ্ছে। গাছেরও তো মন আছে, নাকি— ভাবছিল বুড়ো।



।। দুই।।

এক একটা দিন সংঘমিত্রার কিছু ভালো লাগে না। আজ এরকমই একটা দিন। এখন জানুয়ারির শেষ। বেশ ভালোই ঠাণ্ডা আছে এখনও। আর ক'দিন পরেই মাঘোৎসব। কাল সন্ধেবেলা সংগীত ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় গানের রিহার্সাল শুনেছিল। ওদের বাড়ির সামনের বাগানেও এখন নানারঙের ফুলের মেলা। লাল, বেগুনি, সাদা, নীল, হলদে। আজ কলেজে বেরোনোর সময়ও অনেকক্ষণ ফুলগুলোর দিকে ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে ছিল সংঘমিত্রা। আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওদের। তবুও আজ সকাল থেকেই সংঘমিত্রার কিছু ভালো লাগছিল না। সকাল থেকেই মনের ভিতর একটা মেঘ যেন জমেছিল ওর। কাটছিল না কিছুতেই। এরকম এক একদিন হয় ওর। তখন কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না। তখন স্কুটি চালিয়ে একা একা কোপাইয়ের দিকে চলে যায়। এদিকটায় কোপাই শীর্ণতোয়া। তার পাড়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকে অনেকক্ষণ। দূরে, রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলে যায়। গ্রামের পথে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল যেন কে। কে যেন 'চই-চই' করে হাঁসগুলিকে ডাকছে। একা একা বসে থাকতে থাকতে এসব দেখে সংঘমিত্রা। একা বসে থাকতে থাকতেই ওর মনের মেঘগুলো একসময় কেটে যেতে থাকে। তখন আবার সবকিছু ভালো লাগে। কেন যে এরকম হয়— তা আজ অবধি বুঝতেই পারেনি সংঘমিত্রা।

আজ কলেজে ক্লাস নিতে গিয়েও বারেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। পড়ানোর কথা ছিল বৈষ্ণব পদাবলী। ভালোই লাগল না পড়াতে। দশ মিনিট আগেই ক্লাস শেষ করে টিচার্স রুমে ফিরে এসেছিল। টিচার্স রুমে ঠিক জানালার পাশেই সংঘমিত্রার চেয়ারটা। এখানে বসলে জানালা দিয়ে শহরের রাস্তাটা দেখা যায়। মফস্‌সল শহরের এই রাস্তাটা বেশ ব্যস্ত। সারি সারি দোকান। রাস্তায় পশরা সাজিয়ে ফেরিওয়ালা। তারই মাঝে এক চিলতে জায়গা করে নিয়ে একটা শনি মন্দির। কত মানুষের আনাগোনা। সবাই ব্যস্ত। এই রাস্তায় অলস লোক খুব একটা চোখে পড়েনি সংঘমিত্রার। টোটো, সাইকেল রিক্সা, রাস্তার মাঝখানে বাস দাঁড় করিয়ে কণ্ডাক্টর হেঁকে যাচ্ছে— 'আমোদপুর, সাঁইথিয়া, আমোদপুর, সাঁইথিয়া...'। ধুলো ওড়ে রাস্তায়। এসব দেখতে খুব একটা খারাপ লাগে না সংঘমিত্রার। মানুষের বেঁচে থাকাটা তো বোঝা যায়। টিচার্স রুমে ফিরে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসেছিল সংঘমিত্রা। আজ বছর তিনেক হলো মফস্‌সলের এই শহরটায় লেকচারারের চাকরি পেয়েছে। বাড়ির কাছেই কলেজ। ওদের শ্যামবাটির বাড়ি থেকে টোটোয় কুড়ি মিনিট। ভুবনডাঙা পেরোলেই বোলপুর। তারপর স্কুলডাঙার রাস্তা ধরলেই ওদের কলেজ। শ্যামবাটির বাড়িটা বানিয়েছিল বাবা। ছ'কাঠার মতো জমি। ছোট্ট দোতলা বাড়ি ঘিরে বাগান। বাবার ইচ্ছে ছিল, সংঘমিত্রা শান্তিনিকেতনে বড়ো হবে। তাই হয়েছে। পাঠভবন থেকে বিশ্বভারতী। তারপর বোলপুরের এই কলেজে চাকরি। সংঘমিত্রা জানে, ওর হাতে নেই ভুবনের ভার। অবশ্য ভুবনের ভার নিতেও সংঘমিত্রা কখনো চায়নি। বরং চেয়েছে, এই শ্যামবাটির বাড়ি, তাকে ঘিরে বাগান, মন খারাপ হলে কোপাইয়ের ধারে ছুটে যাওয়া, সোনাঝুরির বন, নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, এই সূর্যোদয়, ধু-ধু মাঠের প্রান্তে আকাশ কমলা করে সূর্যাস্ত— এসব নিয়েই নিজের মতো একা একা থাকতে। তাই-ই আছে সে। তবু মাঝে মাঝে কেন যে এরকম মন খারাপ হয়ে যায়— সেটাই বুঝতে পারে না সংঘমিত্রা।

ইংরেজি ক্লাস শেষ করে ইনুদি টিচার্স রুমে এসে ঢোকে। মাঝবয়সি, ঈষৎ পৃথুলা। ঢক্‌ঢক্ করে জল খায়। তারপর শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বলে— পড়িয়ে তো এলাম। কিন্তু কী বুঝলো কে জানে। একটারও তো ক্লাসের দিকে মন নেই। এসব কথায় কান দেয় না সংঘমিত্রা। নিরুত্তাপ, টিচার্স রুমের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখতে থাকে। উল্টোদিকের ফুটপাথে কমলালেবুওয়ালার ডালা থেকে কমলা কিনছে দুই তরুণী।

ইনুদি এবার সংঘমিত্রার দিকে ফেরে। বলে— কী রে, কথা বলছিস না কেন?

— তুমি বলছ তো, বলো, জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা

দেখতে দেখতেই বলে সংঘমিত্রা।

সংঘমিত্রার কাছ ঘেঁষে আসে ইনুদি। বলে— মন খারাপ বুঝি? তা মনের আর কী দোষ! বয়স হয়ে যাচ্ছে, তবু বিয়ে-থা করছিস না। এরকমই হবেই।

সংঘমিত্রার গত নভেম্বরে তিরিশ পূর্ণ হলো। ওর বন্ধুদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। কারও কারও বাচ্চাকাচ্চাও হয়েছে। ও বিয়ে করল না এখনও। বিয়ে করবে কী, আজ এতবছর কাউকে ভালোই বাসতে পারল না।

— আমি তো চা-উলি। কে বিয়ে করবে আমাকে? নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বলে সংঘমিত্রা।

— চায়ের দোকানটা তো তোর হুজুগ।

হুজুগই বটে। এম-এ পাশ করার পর যখন চুপচাপ বসেছিল বাড়িতে, তখন ওর ইচ্ছে হয়েছিল একটা চায়ের দোকান খুলবে। সন্ধের ঝোঁকে সেই চায়ের দোকানে খদ্দের এসে চা খাবে আর গল্প করবে। ওর বাবা এ ধরনের একটি প্রস্তাবে তুমুল সায় দিয়েছিল। আর মা বলেছিল— এ আবার কী কথা? আমাদের বাড়ির মেয়ে চা বেচবে? তবে মায়ের আপত্তি ধোপে টেঁকেনি। বাবার প্রশ্রয়ে আর নিজের জেদে বাড়ির বাগানের পাশে এক চিলতে জমিতে একটা চায়ের দোকান খুলে ফেলেছিল। দোকানের নাম 'পেয়ালা-পিরিচ'। লেকচারারের চাকরি পেয়ে গেলেও চায়ের দোকানটা বন্ধ করেনি। বরং নিজের মতো করে সাজিয়েছে দোকানটাকে। রোজ কলেজ থেকে ফিরে সন্ধেবেলা দোকানে এসে বসে। তবে, ওর চায়ের দোকানে ও সবাইকে চা বেচে না। মানুষ বিচার করে তবেই ও চা বেচে। দোকানে একটা স্লোগান লিখে রেখেছে ও— 'ভালো চা, ভালো মানুষদের জন্য'। সংঘমিত্রার ধারণা, ও মুখ দেখে মানুষ চিনতে জানে।

— আমি এবার উঠি। আর তো ক্লাস নেই। আজ একটু তাড়াতাড়ি দোকান খুলব। বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় সংঘমিত্রা।

— সাবধানে আয়। তবে যেটা বললাম, সেটা একটু মনে রাখিস। বিয়ে না করে একা একা এভাবে কতদিন থাকবি?

কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখে সংঘমিত্রা। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে। আজ বাড়ি ফিরতেও ভালো লাগছে না। বিকেলের আলো এখন নরম হয়ে এসেছে। তবু এ রাস্তায় ব্যস্ততা কমেনি। ব্যস্ত মানুষজন। টোটো, রিক্সা, বাস। আমোদপুর, সাঁইথিয়া, আমোদপুর-সাঁইথিয়া...। ধুলো।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে এসব দেখেই যেতে থাকে সংঘমিত্রা। আজ মনটা কিছুতেই ভালো হচ্ছে না।

* * *

তালতোড়ে স্কুল শেষ করে রোজ এই রাস্তা দিয়েই সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরে অরণ্য। আর রোজই ফেরার সময় লক্ষ্য করে বিকেলের আলো যখন নরম হয়ে আসছে, এই সময়টায়, বাড়ির ঝুলবারান্দায় বুড়ো দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে ফিচেল হাসি। বুড়ো লোকটাকে বড়ো অদ্ভুত লাগে অরণ্যর। চারদিকে গাছপালা ঘেরা এই বাড়িটায় বুড়ো একা থাকে। একদিন কথায় কথায় বলেছিল, এই গাছগুলি নাকি ওর ভাই-বোন। ওরা একসাথেই জন্মেছে। একসাথেই বড়ো হয়ে উঠেছে। অরণ্য একদিন বুড়োর বয়স জানতে চেয়েছিল। ফিচকি হেসে দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে বুড়ো বলেছিল— শতাব্দী প্রাচীন। দেখছ না, আমার গায়েও কেমন শ্যাওলা জমেছে। এসব কথার কোনো উত্তর হয় না। কাজেই চুপ করেই ছিল অরণ্য।

আজকেও বুড়ো দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। অরণ্যকে দেখে দূর থেকেই হাত নাড়ল। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল— কী মাস্টারমশাই, স্কুল শেষ হলো?

— হ্যাঁ— ঘাড় নেড়ে বলল অরণ্য।

— তাহলে সাইকেলটা দরজার কাছে রেখে ওপরে এসে একটু চা খেয়ে যাও। কথাও আছে একটু। দরজা খোলাই আছে। সোজা ওপরে উঠে এসো।

তালতোড়ের স্কুলটায় ছাত্র বেশি, টিচার কম। এক একজন টিচারকে বেশি ক্লাস নিতে হয়। বক্‌বক করতে করতে মুখে ফেনা উঠে যায়। তেষ্টা পায়। একটু তেষ্টা নিয়েই সাইকেল চালিয়ে ফিরছিল অরণ্য। কাজেই চা খাওয়ার কথায় সে আর আপত্তি না করে সোজা ওপরে উঠে এলো। বুড়োর বাড়িটা বেশ সাজানো। বুড়োর বউ আছে। বউ শহরে থাকে। মাঝে মাঝে এখানে এসে দু-একদিন থেকে যায়। বাকি সময় বুড়ো একাই থাকে। বুড়ো মানুষটা রহস্যময়, কিন্তু খারাপ নয়। আশপাশের পাঁচটা লোক বুড়োকে মান্যি করে। বড় হেঁয়ালি করে কথা বলে বুড়ো। অনেক কথারই কোনো মানে বোঝে না অরণ্য। কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। কোথাও খুব একটা বেরোয় না বুড়ো। সারাদিন বাড়িতেই থাকে। তবে, কখনো কখনো বুড়োকে অনেকেই দেখছে, গোয়ালপাড়ার রাস্তা ধরে আনমনে হেঁটে যেতে। কোথায় যায়, তা অবশ্য জানে না কেউ।

বুড়ো কেটলিতে চা বসিয়েছে। বলে— জানতাম এই সময়ে তুমি ফেরো। বলতে পারো তোমার জন্যই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবছিলাম, একসঙ্গে চা খাব।

চেয়ার টেনে বসে অরণ্য। স্কুল থেকে ফিরছ, কিছু খাবে—

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators
&
Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

Best Compliments from-

ELGA PAINTS & POLYMERS

Manufacturer of

Quality Paints & Ancillaries

30D, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700060

Phone : 033 2406 2431

জিজ্ঞাসা করে বুড়ো।

— না, না, ব্যস্ত হবেন না।

— আহা, আমার অসুবিধা নেই। আজ সকালে বেকারির কেক বিক্রি করতে এসেছিল। কিনেছি। আমার আবার তোমাদের মতো সাহেবি কেক পছন্দ নয়। আমার বেকারির কেক অনেক ভালো লাগে। একটু খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে।

হাসে অরণ্য। খিদে একটু পাচ্ছিল বটে। আসলে ওদের স্কুলটা এমন জায়গায়, সেখানে খাবারের দোকান ধারেকাছে নেই। অরণ্য যে টিফিন নিয়ে আসবে সে উপায়ও নেই। অরণ্য এখানে একা থাকে, রতনপল্লিতে ঘর ভাড়া নিয়ে। সকালে স্কুলে আসার আগে দুটো সিদ্ধভাত করে খেয়ে আসে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আবার রান্নাবান্না। ফলে খিদে পেয়েই যায়। চেনাশোনা অনেকেই বলে, এবার এই গ্রামের স্কুলটা ছেড়ে শহরের স্কুলে চাকরি নিতে। কিন্তু অরণ্যর ইচ্ছে করে না এই জায়গাটা ছাড়তে। পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছে এই স্কুলে। একটা অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে। স্কুলের পাশেই বিরাট ধানক্ষেত। তার পাশে একটা দীঘি। এখন, এই শীতে, ধানকাটা হয়ে গেছে। মাঠ জুড়ে শুধু খড়। সারারাত হিম পড়ে সেই খড় ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। বিকেলের আলো মরে এলেই পুকুরের ওপর হাল্‌কা কুয়াশার চাদর। এসব বেশ মোহময় লাগে অরণ্যর।

— নাও, চা খাও। সামনের টেবিলে চা নামিয়ে রাখে বুড়ো।

— আপনিও নিন। বলতে বলতে অরণ্য এক কাপ চা তুলে নেয়।

— নিচ্ছি। আচ্ছা, তুমি যেন কোন সবজেক্টের টিচার?

— সায়েন্স। কেমিস্ট্রি পড়াই।

— বেশ, বেশ, তাহলে তো তুমি বুঝবে। আচ্ছা বলো তো, আমাদের এই জীবনটার অর্থ কী?

অবাক হয় অরণ্য। বলে— কী জানি, জানি না। আসলে ভেবে দেখিনি কখনও।

হাসে বুড়ো। বলে— অবাক হলে তো। আমি অনেককে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছি। আসলে কেউই জানে না। আমিও জানতাম না, বুঝলে। তারপর একদিন একটা অদ্ভুত লোক এসে জীবনটার মানে বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

— কী রকম?

— সে অনেকদিন আগের কথা। ওই যে গোয়ালপাড়ার রাস্তা, ওই রাস্তা ধরে একদিন একা একা, ঘোরের ভিতর হাঁটছি। যেন ভূতে ধরেছে আমাকে। হঠাৎ দেখি, আগে আগে একটা ফঙ্গবেনে গোছের লোক চলেছে। পরনে তাপ্পিমারা জামা। আর গলা ছেড়ে গান গাইছে। কী সুন্দর যে গানের গলাটা— কী বলব তোমাকে।

— তারপর?

— আমি তো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তার পাশে এলাম। আমাকে যেন সে খেয়ালই করল না। হাঁটতে হাঁটতে একের পর এক গান গেয়েই যেতে থাকল। অনেকক্ষণ পর গান থামলে আমাকে খেয়াল করল। বলল— কী হে, গান শুনছিলে বুঝি!

একটু উদাস হয়ে কী যেন ভাবে বুড়ো। তারপর আবার বলে— লোকটা চালচুলোহীন, বাউন্ডুলে গোছের, বুঝলে। আমার লোকটাকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি বললাম— তোমার তো ভারি দুঃখ, তাই না! লোকটা একচোট হেসে নিল। তারপর বলল— ধুস, ধুস, দুঃখ কিসের? আমার ঘরের জানালা ভাঙা। সেই ভাঙা জানালা দিয়ে বৃষ্টির জল এসে আমার ঘর ভিজিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু সেই ভাঙা জানালা দিয়ে তো কখনো কখনো জ্যোৎস্নার আলোও এসে পড়ে। বৃষ্টির জল যে আমার ঘর ভাসিয়ে দিয়ে যায়, সেটা আমি কখনো মনে রাখি না। কিন্তু ওই যে এক-আধদিন ভাঙা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোও এসে পড়ে— ওটাই আমি মনে রাখি।

এতক্ষণ বলে এবার অরণ্যর মুখের দিকে তাকায় বুড়ো। বলে— এটাই হচ্ছে জীবনের অর্থ। বুঝলে কিছু?

বুড়োর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না অরণ্য। তবু বলে— বেশ বুঝলাম।

— হ্যাঁ। হ্যাঁ। বুঝবে, বুঝবে। আমাদের সবার বুকের ভিতর ওই জ্যোৎস্নার আলোটাকে চারিয়ে রাখতে হবে, বুঝলে।

বুড়োকে আবার পাগলামি ধরেছে। কথা ঘোরায় অরণ্য। বলে— আপনার বাড়িটা কিন্তু বেশ। আমার খুব ইচ্ছা একদিন এসে অনেকক্ষণ থেকে যাই আপনার বাড়িতে।

ফিচেল হাসি হেসে বুড়ো বলে— থাকলেই পারো। এই বাড়িটা ম্যাজিক বাড়ি। এখানে এসে যে যার মনের সুপ্ত ইচ্ছা যদি বলে ফেলে, তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়ই। আজ কিন্তু সে ইচ্ছা জানানোর দিন। বাইরে তাকিয়ে দেখ, কী এক আশ্চর্য আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এক জীবনে এ আলো খুব কমদিনই দেখা যায়। একে বলে হৃদয়ের আলো।

অরণ্য বাইরের দিকে তাকায়। সত্যি, গাছপালার ফাঁক দিয়ে এক অত্যাশ্চর্য কমলা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কী মোহময় এই আলো। সত্যি, অরণ্যরও তো একটি গোপন ইচ্ছা আছে। সে ইচ্ছা ও কাউকে বলতে পারেনি। বলতে গেলেই অসম্ভব একটা লজ্জা জড়িয়ে আসে ওর শরীরে। বুকের কাছে ধুকপুক করে। গলা শুকিয়ে আসে। কারোর চোখের দিকে তাকাতে পরে না।

ফলে ইচ্ছেটা আর বলা হয়ে ওঠে না কখনো। ইচ্ছেটা বুকের ভিতরই থেকে যায়। অরণ্য অবাক হয়ে বাইরে, গাছের পাতায় মাখামাখি সেই অত্যাশ্চর্য আলো দেখতে থাকে।

এইসময় বাইরে অনেক কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সমস্বরে কারা যেন ডাকে— দাদু, অ দাদু, বাড়িতে আছো? আমরা তোমার সাথে একটু কথা বলতে এসেছিলাম গো।

* * *

আজকে চায়ের দোকানে একাই বসেছিল সংঘমিত্রা। কিছুই আসলে ভালো লাগছিল না ওর। দুটো লোক চা খেতে এসেছিল। ভালো লাগেনি বলে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের। বলেছে— এখন চা বিক্রি হবে না। একা বসে বসে একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল। চারপাতা পড়ার পর সেটাও আর ভালো লাগছে না বলে বন্ধ করে রেখেছে। তারপর চুপচাপই বসে রয়েছে।

সন্ধে হয়ে এসেছে এখন। ধুনোর গন্ধ আসছে দোতলা থেকে। ধুনোর গন্ধটা বেশ লাগে সংঘমিত্রার। মনের মেঘটা আজ কাটছে না কিছুতেই। আরও কিছুক্ষণ এরকম বসে থাকার পরে, সংঘমিত্রা হঠাৎ নজর করল, সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে তার চায়ের দোকানের দিকেই আসছে অরণ্য। অরণ্য একটা স্কুলে চাকরি করে সংঘমিত্রা জানে। কিন্তু কোন স্কুলে সেটা কখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মাঝে মাঝেই অরণ্য এখানে চা খেতে আসে। মাথা নীচু করে বসে চা খায়। তারপর দাম মিটিয়ে উঠে চলে যায়। কোনোদিন একটাও কথা বলেনি। বড় লাজুক লোকটা।

সাইকেলটা বাইরে রেখে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল অরণ্য। সংঘমিত্রা নিজের অজান্তেই হাত দিয়ে কপালের ওপর চুলটা একটু ঠিক করে নিল, শাড়ির আঁচলটাও গুছিয়ে নিল। মনের মেঘটা হঠাৎ করেই কেটে যাচ্ছে— বুঝল সংঘমিত্রা।



।। তিন।।

স্নান সেরে এসে পারুল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। এই সময়টা একেবারে ওর একার। এসময় আয়নায় ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে। দশবছর বিয়ে হয়ে গেল, এখনও শরীরে একটুও টাল খায়নি। শুধু কোমরের দিকে একটু মেদ জমেছে ইদানীং। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি পারুলের। কত ডাক্তার দেখালো। তারাপীঠ, কঙ্কালীতলায় কতবার মানত করল। তবু এতদিনেও বাচ্চা হলো না। কত শখ করে মেলা থেকে কতগুলো পুতুল কিনেছিল পারুল। সেগুলো তোরঙ্গ বন্দিই হয়ে রইল। গায়ের রংটা চাঁপা, কিন্তু পারুলকে দেখতে খুব একটা মন্দ না। ঠোঁটের ওপরে একটা তিল আছে। হাসলে গজদাঁত দেখা যায়। সারাদিন তো নিজেকে আর দেখা হয় না। এই সময়টাই আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পারুল। দেখে আর নিজের সঙ্গে কথা বলে। সারাদিনে আর সময় কই। গ্রিলের কারখানা সামলাতে সামলাতেই তো দিন কাবার। না দেখলেই মিস্ত্রিগুলো কাজে ফাঁকি দেয়। চোখের আড়াল হবার জো নেই। কারখানাটা বাড়ির লাগোয়া এটাই যা রক্ষে। দুপুরের দিকে মিস্ত্রিগুলোকে খেতে পাঠিয়ে পারুল বাড়ি এসে স্নান করে, খায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। আসলে যার দেখার কথা ছিল, এতবছরে সে ভালো করে চোখ মেলে দেখলই না পারুলকে। বাবা অনেক দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল লোকটার সঙ্গে। লোকটা ভারি ভালো। কিন্তু কীরকম একটা ঘোরের ভিতর থাকে সারাদিন। মনে হয় যেন এ জগতেরই লোক নয়। বিয়ের প্রথম রাতে কত আদর করে কথা বলে লোকে। আর এই লোকটা ওকে বলেছিল— আমি জীবনে কোনোদিন হিসেব কষতে পারিনি জানো! এ নিয়ে যেন আবার রাগ করো না পরে। কিন্তু রাগ না করে কী থাকা যায়? ব্যবসাটা তো পারুলকেই দেখতে হয়। রাগ হয়ে যায় মাঝেমধ্যে। যখন বিয়ের পর প্রথম এসেছিল এ বাড়িতে, তখন এ বাড়ির কী ছন্নছাড়া অবস্থা। থাকার মধ্যে লোকটার বুড়ি মা। সেই সংসারের হাল ধরে পারুল বাড়ির চেহারা পাল্টে দিয়েছে। কাঁচা বাড়ি প্রথমে পাকা হয়েছে। তারপর দোতলা। গ্রিলের কারখানা বড় হয়েছে। বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ এসেছে। এবার গরমে শোয়ার ঘরে এ-সি বসাবে— ঠিকই করে রেখেছে পারুল। কতবার পারুল লোকটাকে বলেছে— ওই লড়ঝড়ে বাইকটা এবার পাল্টাও। অনেক নতুন মডেল বাজারে এসেছে, একটা কেন। তা শুনলে তো লোকটা। বলেছে, এই বাইকটাকে ও পাল্টাতে পারবে না। বাইকটা নাকি কাঁদবে। শোন কথা! এরকম আজগুবি কথা কেউ বলে! লোকটা যে কী— পারুল বুঝেই পায় না। তবে, লোকটাকে দেখে বড় মায়া হয় পারুলের। সারা সকাল আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে দুপুরে যখন লোকটা খেতে আসে বাড়িতে, তখন ওর রোদে পোড়া মুখটা দেখে পারুলের ভারি

মায়া হয়। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে পারুল দেখেছে মাথার নীচে হাত রেখে কাত হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে লোকটা। তখনও পারুলের মায়া হয়েছে। পারুল এও জানে, মাঝে মাঝে লোকটা আমোদপুর যায়। ওখানে এক ভাতউলির দোকানে ভাত খায়। সারা দুপুর সেখানেই কাটিয়ে বিকেলে বাড়ি ফেরে। লোকটা কিছু বলেনি পারুলকে কোনোদিনই। যারা দেখেছে, তারা এসে বলেছে। তবু, পারুলের রাগ হয়নি। পারুল জানে, এ লোক ভালোবাসার মানেই জানে না।

আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছিল পারুল। এখনও হাসলে গজদাঁত দেখা যায়। যৌবনের চপলতা কেটে গিয়ে এখন এক ধরনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য পারুলের শরীরে ছড়াচ্ছে। স্বামী আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, এই ফাঁকে কতজন যে পারুলের কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারুলের কাঠিন্য তাদের কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। মাঝেমাঝে ভাবে পারুল, যেমন এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, সত্যিই কি তার ভিতর সব ভালোবাসা শুকিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন গ্রিলের কারখানা ঠেলতে ঠেলতে সেও কি ওই গ্রিলগুলির মতোই হয়ে যাচ্ছে? নকশা করা, কিন্তু শক্ত, লোহার। আবার, ভালোবাসা যদি শুকিয়েই গিয়ে থাকবে, তবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেন এখনও নিজেকে দেখে পারুল? কেন এখনও নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়?

বাইরে এই সময় বাইক থামার শব্দ হলো। মিলন ফিরে এসেছে। আজকে একটু তাড়াতাড়িই যেন ফিরেছে— মনে হলো পারুলের। কাল থেকেই মিলন বড় চুপচাপ। নজর এড়ায়নি পারুলের। খেতে বসে অন্যদিন দু-চারটে কথা বলে তাও। কাল একেবারে চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল। কাল বড় যত্ন করে আমোদি মাছ রান্না করেছিল পারুল। ঝাল ঝাল করে। আমোদি মাছ মিলনের বড় পছন্দের। মুখে অবশ্য বলেনি কখনো। কিন্তু খাওয়া দেখেই বুঝেছে পারুল। কাল সেটাও খুব একটা মন দিয়ে খেল বলে মনে হলো না। কাল থেকেই কী যেন ভাবছে লোকটা। ভেবেই যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই পারুল কিছু জানতে চায়নি। যা ভাবছে ভাবুক। এক একটা লোক আসলে এরকমই হয়। ঘোরের ভিতর থাকতে ভালোবাসে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই মিলন বলে— খেয়ে একবার বেরোতে হবে। এ কথার তেমন কোনো উত্তর অবশ্য পারুল দিল না। শান্ত চোখে তাকালো একবার। মিলন জানে, এরপর পারুল নিঃশব্দে ওর খাবার সাজিয়ে দেবে। দশবছর কেটে গেল— পারুলকে এখনও কেমন যেন অচেনা মনে হয় মিলনের। শান্ত দীঘির মতো, তল পাওয়া যায় না। সে দীঘিতে কোনো ঢেউ নেই।

স্নান করতে ঢুকে জলের কল খুলে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মিলন। আসলে কাল থেকেই তার মনে হচ্ছে, কী যেন একটা হতে চলেছে। কাল মাটিতে কান পেতে সে অতল থেকে উঠে আসা এক রহস্যময় গুমগুম শব্দ শুনেছে। এ শব্দ কিসের বার্তা তা মিলন বুঝতে পারছে না। শুধু এটুকু বুঝেছে, এ শব্দ একটা কোনো বার্তা তো নিয়ে আসছেই। কাল সকালে বুড়োর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রতনপল্লির দিকে যাচ্ছিল মিলন। যেতে গিয়ে গোয়ালপাড়ার মুখে ভিড়ভাট্টা দেখে বাইক থামিয়ে নেমে পড়ল। বুড়ো বটকে ঘিরে সেখানে ভিড় জমিয়েছে সবাই। হাত-পা নেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। আর কয়েকটা লোক, কী সব যেন মাপজোক করছে ফিতে দিয়ে। ভিড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল মিলন। সবাই চেনা মুখ। গোয়ালপাড়ায় থাকে।

কী হয়েছে রে— ভিড়ের দিকে মুখ করেই জিজ্ঞাসা করেছিল মিলন।

— রাস্তা চওড়া হবে গো, এসব দোকান ভাঙা পড়বে।

— তা'লে তোরা কোথায় যাবি?

— আমরা আরও দূরে সরে যাব। বলছে, এই বুড়ো বটও কেটে দেবে। কিচ্ছুটি থাকবে না এখানে।

— অ্যাঁঃ, বললেই বুড়ো বট কাটতে দেব নাকি আমরা? আবদার আর কী— ভিড়ের ভিতর থেকে যে একজন যেন বলে উঠল। সবাই গলা মেলালো তার সঙ্গে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বোঝা গেল না কে কী বলছে। শুধু তীক্ষ্ণ শিসের মতো কিছু শব্দ হাওয়ায় উড়োউড়ি করতে লাগল। এরই ভিতর কে একজন যেন গলা চড়িয়ে বললো— আমাদের বড় ঠাকুর বাস করে বুড়ো বটে। বুড়ো বট কাটা যাবেনি কো যাবেনি। আবার সবাই সমস্বরে গলা মেলালো। তীক্ষ্ণ শব্দগুলি আলাদা করে বোঝা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ এরকম চলার পর ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন গলা চড়ালো। বললো— চেঁচাস কেনে? থাম তোরা। তোরা দেব না বললেই হবে? কানু ঘোষের লোক ঠিকাদারি পেয়েছে। কানু ঘোষ লোক পাঠিয়ে তোদের মারবে। যে বলছিল তার কথা শেষ হলো না। তার আগেই কে যেন আরও গলা চড়িয়ে বলল— অ্যাঁঃ, আমাদের বড়ো ঠাকুর বড়ো না, তোমার কানু ঘোষ বড়ো? পাট্টির লোক পাঠাবে? কত পাঠাবে পাঠাক না। আমাদের বড়ো ঠাকুর আছে। ভিড়টা সমস্বরে বললো— আছে, আছে, আছে। আমরা বুড়ো বট কাটতে দেবনি, দেবনি, দেবনি। মিলনের মনে হলো, এই কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা ছন্দ আছে। সেই ছন্দ যেন

ছড়িয়ে পড়ছে বুড়ো বটের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। আর যেই এমন ভাবনা মনে এলো, তখনই কেমন যেন ঘোর লাগল মিলনের। মনে হয়েছিল ওর এখনই আমোদপুর যাওয়া দরকার। খুব দরকারি একটা কথা জানাতেই হবে টুকিকে। তারপর, রতনপল্লির দিকে আর পা বাড়ালোই না মিলন। অবশ্য রতনপল্লিতে তো ওর যাওয়ার তেমন ইচ্ছেও ছিল না। বাইক ঘুরিয়ে সোজা আমোদপুর।

হঠাৎ করে ওকে দেখে টুকি একটু অবাকই হয়েছিল। বলেছিল— কী গো, আজ এই সক্কালবেলা?

— তোর সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা আছে টুকি।

— কী কথা?

টুকিকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিসে গলায় মিলন বলেছিল— তুই তো ভাবিস আমি আবোল-তাবোল বকি। কিন্তু মাইরি বলছি, আমার মতো আরও কতজন আছে, গাছের ভাষা বোঝে। ওই যে আমাদের নতুন পল্লির বুড়ো।

না হেসে আর পারেনি টুকি। বলেছিল— এই বলতে এতখানি পথ বাইক চালিয়ে এলে? দেশে বুঝি পাগলের সংখ্যা বাড়ল। আমার বলে এখন মরার সময় নেই। একটু পরে খদ্দেরের লাইন লাগবে। অর্ধেক রান্নাই হয়নি এখনও।

— সে তুই খদ্দের সামলা গে। আমি এখন চলি, আমাকে এখনই গোয়ালপাড়ায় ফিরতে হবে।

— যাবে'খন। ভাত চাপাই। দুটো খেয়ে যাও।

— না, আজ খাবো না। কানু ঘোষের লোকেরা গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বট কেটে দেবে বলেছে। আমি যাই। বুড়ো বটকে ছুঁয়ে আমায় বসে থাকতে হবে।

আর দাঁড়ায়নি মিলন। বাইকে উঠে স্টার্ট দিয়েছিল। ফিরতেই হবে তাড়াতাড়ি। আর মিলনের দ্রুত চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টুকি ভাবছিল— যাওয়ার মুখে কী যেন বলে গেল লোকটা!

তা, এ তো গেল কালকের কথা। আজ সকালে অন্য কোথাও যায়নি মিলন। ঘুম থেকে উঠে, চা-মুড়ি খেয়ে সোজা বুড়ো বটের তলায়। বাইকটা একপাশে রেখে বুড়ো বটের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে রাস্তা দেখছিল। কানু ঘোষের লোক এই রাস্তা চওড়া করবে। প্রান্তিক স্টেশন পেরিয়ে এ রাস্তা সোজা গিয়ে উঠবে ন্যাশনাল হাইওয়েতে। কত গাড়ি আসবে তখন কলকাতা থেকে। তখন এই বুড়ো বট আর থাকবে না। এরকম ভাবতে ভাবতেই একসময় ঘুমিয়েই পড়েছিল আর এই ঘুমের ভিতরই শুনেছিল মাটির গভীর থেকে উঠে আসছে এক রহস্যময় গুমগুম শব্দ। ময়দানব যেন জেগে উঠছে। একটা কিছু হয়ে যাবেই এবার। ভয়ে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মিলনের। আর তখন প্রথমেই পারুলের কথা মনে পড়েছে তার। মনে পড়তেই বাড়ি ফিরে এসেছে।

স্নান করে বেরিয়ে মিলন দেখল, টোবিলে ভাত সাজিয়ে পারুল বসে আছে। তেমনই নীরব, শান্ত। কালকের কথা আর কিছু বললো না পারুলকে। এমনকী, আজ সকালের কথাও বলেনি। বললে খামোকা পারুল চিন্তা করবে। আটকে দেবে ওকে। বাড়ি থেকে হয়তো ওকে বেরতেও দেবে না। পারুল চায় না, ওর আদাড়ে-বাদাড়ে ঘোরা ভুলো মনের স্বামীটা কোনো বিপদে পড়ুক। কিন্তু বুড়ো বটের কথা তো না বললেও নয়। বুড়ো বটের কাছে পারুলের যে একটা মানত ছিল। বুড়ো বটের ডালে লাল সুতো বেঁধেছিল পারুল।

ভাত মাখতে মাখতে কিছুটা আপন মনেই, পারুলকে শুনিয়ে বললো— একটা কিছু হবে।

কী যেন একটা ভাবছিল পারুল। মিলনের কথায় হুঁশ ফিরল। চমকে উঠে বললো— কী হবে?

— হবে, হবে, আমি বুঝতে পারি সব।

— কী যে আবোল-তাবোল বক সারাক্ষণ। কী হবে তা বলো না পরিষ্কার করে।

— কী যে হবে, তা তো আমিও বুঝতে পারি না। বুঝতে পারলে তো বলবো।

— বুঝতে যদি পারোই না, তাহলে এসব আবোল-তাবোল বক কেন সারাক্ষণ?

— কিছু তো একটা হবেই। বুড়ো বটেরও তো মন আছে কিনা, তুমি বলো। ভাত খেতে খেতে একটা কিছু উত্তরের প্রত্যাশায় পারুলের মুখের দিকে তাকায় মিলন।

— কার মন আছে, কার নেই, সে তুমিই জানো। আমি ওসব খোঁজ রাখি না। শান্ত, কিন্তু কেটে কেটে বলল পারুল।

— গোয়ালপাড়ার দিকে রাস্তা চওড়া হবে। কানু ঘোষের ঠিকাদাররা কাল মাপজোক করতে এসেছিল। বলেছে, বুড়ো বটটা কেটে দেবে।

একটু চমকালো কি পারুল? মিলন ওর মুখের দিকে তাকায়। ভাবে, বুড়ো বটের কাছে পারুল একটা খোকা চেয়েছিল।

* * *

বুড়োর আজকাল বড় ঝিমুনি আসে। মাঝে মাঝেই আসে। এই যেমন আজ দুপুরের খাওয়ার পর পুবদিকের বারান্দায়

ইজিচেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। কে যেন বলেছিল, সুগার বাড়লে এরকম যখন-তখন ঝিমুনি আসে। ডাক্তার দেখাতে বলেছিল। ওসবে পাত্তাই দেয়নি বুড়ো। শরীরে এখন শ্যাওলা জমছে বুড়ো জানে। তবে আজকাল ঝিমুনি এলে বুড়োর চোখের সামনে কতকিছু ভেসে ওঠে। যেন ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখেছে। কত ছবি, ফেলে আসা দিনকালের ছবি। কোনোটা রঙিন, কোনোটা সাদাকালো। তাহলে কি সে-ও খুব প্রাচীন হয়ে গেল? বটের মতো? তারও কি শরীর বেয়ে ঝুড়ি নামতে শুরু করেছে? হবে হয়তো। আজ ঝিমুনির ভিতরই বুড়োর চোখের সামনে সব অদ্ভুত ছবি ভেসে উঠতে শুরু করেছিল। বুড়ো দেখছিল, অন্তহীন জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে চরাচর। সেই অন্তহীন জ্যোৎস্নার ভিতর সে যেন এক অতি প্রাচীন বাড়ির ছাদে পেটকাটি চাঁদিয়াল ওড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি এক ভূতে পাওয়া নিস্তব্ধ আকাশে সেই পেটকাটি চাঁদিয়াল একা একা উড়ে চলেছে। কী অপার্থিব সেই দৃশ্য। আর সেই অন্তহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ছাদের কার্নিশের কিনারায় দাঁড়িয়ে দু-হাত বাড়িয়ে রাতপরির মতো এক নারী ডাকছে। ডেকেই যাচ্ছে। তার মুখটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে বুড়োর। কিন্তু চিনতে পারছে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে, কবে, কোথায়, কোনযুগে এই নারীর সঙ্গে তার যেন দেখা হয়েছিল। কোনো এক মোহময়ী জ্যোৎস্নায় সেই অপরূপা নারী তার সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিল, তার হাত ধরে। তারপর? আর কিছু মনে পড়েনি বুড়োর। বরং ঝিমুনি ভেঙে উঠে দেখেছিল বিকেলের আলো একটু একটু করে কমে আসছে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়ছে। একটু পরেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে পড়বে।

বুড়োর মাঝে মাঝেই কতদিন আগেকার কথা মনে পড়ে। সেই যে শহরে ও থাকত, সেই শহরের কথা। তার রাস্তাঘাট, মানুষজনের কথা। সেই যে বিশাল, অথচ নোনাধরা বাড়িটা, দিনের বেলাও যার সিঁড়ির তলায় অন্ধকার জমে থাকত, সেই বাড়িটার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, বৃষ্টিতে একহাঁটু জল জমে যাওয়া গলিটার কথা। সেই ট্রাম লাইন ধরে ভোঁ-কাট্টা ঘুড়ি ধরতে যাওয়ার কথা— সব মনে পড়ে বুড়োর। কিন্তু সে শহর বুড়ো তো কবেই ছেড়ে এসেছে। সেখানে আর ফিরতেও ইচ্ছে করে না তার। সে এখন এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। গাছেদের সঙ্গে ভাইবোন পাতিয়েছে। এখানে, রাত বাড়লে তার বাগানে; ঘোর অমাবস্যাতেও, ছড়িয়ে পড়ে এক অপার্থিব অন্তহীন জ্যোৎস্নার আলো। সে আলোয় শরীর ভাসিয়ে সেই মোহময়ী নারী নেমে আসে। যাকে বুড়ো কোথায় যেন দেখেছে, তবু চিনতে পারে না। বুড়ো আদর করে তার নাম রেখেছে জোছনাময়ী। এখানে, তার এই বাড়িতেই পড়ন্ত বিকেলে সেই কমলা রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ে। যে আলো সারা জীবনে খুব কমই দেখতে পায় মানুষ। বুড়ো সেই আলোর নাম দিয়েছে হৃদয়ের আলো।

উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু উঠতেই হবে এবার। একবার যেতে হবে গোয়ালপাড়ার দিকে। কাল বিকেলে গোয়ালপাড়ার লোকগুলো এসেছিল। আজ ওদের সবাইকে ঝন্টুর দোকানে আসতে বলেছে বুড়ো। সবার সঙ্গে কথা বলবে। একটা কিছু উপায় বের করতেই হবে। না হলে বুড়ো বটকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। বুড়ো জানে, কানু ঘোষ যখন গাছ কেটে রাস্তা করবে বলেছে, তখন করবেই। কানু ঘোষের অনেক টাকা। অনেক লোকজন। কানু ঘোষের বাড়ি থেকে থানায় ভেট যায়। গোয়ালপাড়ার মানুষরা কানু ঘোষের হাত থেকে বুড়ো বটকে বাঁচাবে কী করে— ভাবে বুড়ো। এত অর্থ, এত বল— এদের সঙ্গে বুড়ো লড়বে কী করে? বুড়ো তো এতদিন ধরে যত্ন করে শুধু গাছদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। গাছ তো মানুষের সঙ্গে লড়ে না।

গায়ে মেরুন রঙা র‍্যাপারটা জড়িয়ে রাস্তায় নামে বুড়ো। শীতটা এবার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কাল বাদে পরশু মাঘোৎসব। তখন প্রার্থনা করবে— বুড়ো বট যেন অক্ষয় হয়। এরকমটাই ভেবে রাখে বুড়ো। এই সেদিন কাগজে পড়ছিল, পৃথিবীটা নাকি খুব শীতল হয়ে আসছে। প্রকৃতির নিয়মেই নাকি পৃথিবী একদিন ক্রমে শীতল হয়ে যাবে। তখন এক বরফ পিণ্ডে পরিণত হবে সে। তখন কোনো প্রাণ থাকবে না। শুধু চতুর্দিকে সাদা ধু-ধু বরফ। আর সেই বরফের পৃথিবীর বুকে বয়ে যাবে কনকনে হাওয়া। সে বরফের পৃথিবীর আকাশে কোনো নীল রঙ থাকবে না। নিকষ কালো অন্ধকার এক আকাশ তখন পৃথিবীর ওপরে। তাতে তারাও দেখা যাবে না। নিজের হাতে বড় করে তোলা হৃদয়, রূপকুমার আর নবকুমার— ওরাও কি তখন বরফের গাছ হয়ে যাবে? ডাকলেও সাড়া দেবে না আর? সেই বরফের পৃথিবীতেও কি কোনো কোনো দিন রাতে অন্তহীন জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়বে? সেই অন্তহীন জ্যোৎস্নাতেও কি নেমে আসবে জোছনাময়ী?

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই বুড়ো মাটির রাস্তা ধরে এগোয়। এই অঞ্চলে রাস্তায় পিচ পড়েনি, আলোও বসেনি। তা হবেও না কোনোদিন। অনেক ধরে করে বুড়ো রাস্তাটা এরকম রাখতে রাজি করিয়েছে পঞ্চায়েতকে। এই অঞ্চলে সবাই বুড়োকে একটু মান্যি গন্যি করে— তাই যা রক্ষে। তাতেই বুড়োর কথায় রাজি হয়েছে পঞ্চায়েত। রাতের বেলায়,

আশপাশের বাড়ি থেকে দু-এক ফোঁটা আলো এসে পড়ে রাস্তায়। জোনাকি জ্বলে। সেই আলো আঁধারির রাস্তায় হাঁটতে যে বুড়োর কী ভালো লাগে।

আচ্ছা, ওই বুড়ো বটটার বয়স কত হলো? দেড়শো তো হবেই মনে হয়। অন্তত ওর বয়স দেখে তো তাই মনে হয়। একবার শুনেছিল, অনেক বছর আগে এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছিল এই বুড়ো বটের তলায়। সে ব্রিটিশ আমলে। সাধুর সর্বাঙ্গে ছাই মাখা। পরনে লাল কৌপিন। কোনো কথা বলতো না সাধু। দিনরাত মৌনী থাকত। রাতের বেলায় কারা যেন লুকিয়ে আসত সাধুর কাছে। শুধু তাদের সঙ্গেই সাধু দু-তিনটি কথা বলতো। তাও এমন গলা নামিয়ে কেউ শুনতে পেত না। গোয়ালপাড়ার লোকজন কলাটা-মুলোটা এনে দিত সাধুকে। তাই খেয়ে পেট ভরাতো। তবে সবাই খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত সাধুকে। গোয়ালপাড়ায় এখন যারা থাকে, তাদের বাপ-ঠাকুরদারা বলে গেছে— ও সাধু ছিল নির্ঘাত ভগবান। সেই ভগবানের কাছে কিছু চাইলে মনোস্কামনা পূর্ণ হতই। একদিন মাঝরাতে ওই বটগাছ ঘিরে ফেলল পুলিশ। ধরে নিয়ে গেল সাধুকে। সাধুর ঝোলায় নাকি পিস্তল পাওয়া গেছে। সাধু নাকি স্বদেশী দলের সঙ্গে সাহেব মারতে গিয়েছিল।

সাধু আর ফিরে আসেনি। কিন্তু মুখে মুখে রটে গেল বড় ঠাকুর হয়ে সাধু এখনও রয়ে গেছে এই বুড়ো বটের ঝুরি নামানো শরীরের ভিতর। লোকে এখনও মনে করে এই বুড়ো বটের কাছে মানত করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কত আশা নিয়ে এর মাটি স্পর্শ করা ঝুরিতে লাল সুতো বাঁধে মেয়ে-বউরা।

জোরে পা চালায় বুড়ো। আর ভাবে, বুড়ো বটের ভিতর তো লুকিয়ে আছেন বড় ঠাকুর। পারবেন তো উনি বুড়ো বটকে বাঁচাতে?

* * *

শ্যামবাটি বাজারের দিক থেকে হেঁটে হেঁটে আসছিল অরণ্য। কাল থেকে একটাই প্রশ্ন ওর মনে ঘুরছে— সত্যিই পৃথিবীতে কি কোনো অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে পড়ে? যে আলো জীবনে খুব কমই দেখতে পায় মানুষ? যে আলোতে মনের ইচ্ছে মুখ ফুটে বলে ফেলতে হয়। কাল বুড়োর ঘরের জানালা থেকে এরকম একটা আলো চোখে পড়েছে বটে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে সে আলো তো দেখেনি। সত্যিই কি সেরকম কোনো আলো কাল পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল; নাকি পুরোটাই বিভ্রম? ওই খ্যাপাটে বুড়োর ম্যাজিক? জিজ্ঞেস করতে হবে বুড়োকে। জানাটা খুবই দরকার। আর কতদিন ইচ্ছেটা বুকের ভিতর চেপে রাখবে অরণ্য?

গোয়ালপাড়ার মুখে এসে দেখল, বুড়ো বটের তলায় অনেকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যমণি বুড়ো। পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল অরণ্য।



।। চার।।

এক জামবাটি ভর্তি মুড়ি খাচ্ছিল কানু ঘোষ। সঙ্গে পেঁয়াজি। পেঁয়াজিটা বাড়িতে করা। কানু ভাত খেতে পারে না। রাতে রুটি। দুপুরে জলে ভেজানো মুড়ি। সঙ্গে একটু তরকারি। আগে পাঁঠার মাংসটা খেতে বেশ ভালোবাসত। বাটি ভর্তি ঝাল ঝাল কষা মাংস সাবাড় করে দিত তুড়ি মেরে। এখন খাওয়া নিষেধ। তবু মাঝে মাঝে মাংস খেতে মনটা আনচান করে। কিন্তু নিজেকে সামলে নেয়। তাকে বাঁচতে হবে অনেকদিন। কানু ঘোষের মরে যেতে ইচ্ছে করে না। আসলে ডাক্তার ওকে সব খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে। সুগার বেড়েছে, কলেস্টেরল, সেই সঙ্গে শরীরের ওজনও। ডাক্তার বলেছে— খাওয়া-দাওয়ায় সংযমী না হলে বিপদ আছে। তা শখ করে কে আর বিপদ ডেকে আনতে চায়? তাই ভাত ছেড়ে দিয়েছে, মাংসও। দিনে দু-বার মুড়ি, আর রাতে রুটি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেটকি কানুর মুড়ি খাওয়া দেখছিল। তারও যে খেতে ইচ্ছে করছিল না— তা নয়। অনেক সকালে খেয়ে বেরিয়েছে। এখন কানুর মুড়ি খাওয়া দেখতে দেখতে ওর মুখের ভিতর একটু জল এসে গিয়েছিল। চট করে জিভ দিয়ে জলটা টেনে নিল মুখের ভিতর। এখন খেতে যাওয়া যাবে না। মুড়ি খাবে ও একটু পরে। কানু অফিসে গিয়ে বসলে। মুড়ি আর আলুর চপ। কানু পুরো মুড়িটা খাবে না। অর্ধেকটা বাটিতে ফেলে রেখে যাবে। আলুর চপ কিনে এনে ওই বাকি মুড়িটুকু খেয়ে নেবে ভেটকি। আলুর চপ কেনার পয়সাটা অবশ্য কানুই দেবে। কানুর সাথে, তা নয় নয় করেও প্রায় কুড়ি বছর লেগে আছে ভেটকি। ভেটকির এখন চল্লিশ। কানু ওর থেকে বছর পনেরোর বড়। কানুকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথাই ভাবতে পারে না ভেটকি। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গাল পাড়লেও কানু যে আসলে ওকে সবথেকে বিশ্বাস করে তা



জানে ভেটকি। কানুর সব গোপন কর্ম ভেটকিকে করতে হয়। কানুর যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হবে, ততক্ষণ ভেটকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। কানু কিছু জিজ্ঞেস না করলে নিজে থেকে আগবাড়িয়ে কথা বলার নির্দেশ নেই। কানু সেটা পছন্দ করে না।

আজ সকাল থেকেই বড় হুজ্জুতি গেছে কানুর। কাল রামপুরহাটে দুটো লাশ ফেলে দিয়েছে ওর ছেলেরা। আসলে ও দুটোই একটু আল্টু সাল্টু করছিল। তো, এসব লোককে তো আর ছেড়ে রাখা যায় না। কানু দুটোকেই খালাস করে দিতে বলেছিল। তাই দিয়েছে ওর ছেলেরা। তা নিয়ে কাল থেকে পুলিশ একটু ঝামেলা করছিল। তাই আজ সকালেই কানু ছুটে গিয়েছিল রামপুরহাটে। ও গিয়ে দাঁড়ালে পুলিশ চুপ মেরে যাবে— কানু জানে। কানু ঘোষকে ঘাঁটাবে এমন পুলিশ এখন বীরভূমে নেই। কানু গিয়ে দাঁড়াতে চুপ মেরে গিয়েছিল অবশ্য পুলিশ। তা এসব সামলাতে সামলাতে বেলা বেড়ে গেল। ফিরতে ফিরতে বিকেল। কানু বাইরে কিছু খায় না। এখন ফিরে এসে জামবাটি ভর্তি মুড়ি আর পেঁয়াজি নিয়ে বসেছে।

পেঁয়াজিটা মেনকা ভেজেছে। কানুর বউ। অল্প যেটুকুই খায় কানু, সেটুকু মেনকা রান্না না করে দিলে খায় না। সারাদিনে সংসারের কাছে ওইটুকু তো চাওয়া কানুর। তা ওটুকু চাওয়া মেনকা রাখে। তবে, আজকাল কানুকে নিয়ে একটু চিন্তা হয় মেনকার। বলে— তোমার তো অনেক আছে। এবার সব ছেড়ে শান্ত হয়ে বসো দেকিনি। কিন্তু ছাড়তে বললেই কি সব ছাড়া যায়? একবার ছাড়লেই তো বাকি জীবনের জন্য নিঃস্ব। একথা মেনকাকে কী বোঝাবে কানু? তিরিশ বছর আগে মেনকা পালিয়ে এসে কানুকে বিয়ে করেছিল। কঙ্কালীতলায় মেনকাকে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করেছিল। কিছুই ছিল না তখন কানুর। বিয়ে করে এসে প্রথম রাতটা দুজনে বোলপুর স্টেশনে ওভারব্রিজের ওপর কাটিয়েছিল। তখন এখানে লালপার্টির সরকার। সংসার চালাতে কানু লালপার্টিতে ঢুকে পড়েছিল। তারপর তো কানুর সব হয়েছে। বোলপুরে তিনতলা বাড়ি। একটা স্করপিও, একটা বলেরো আর একটা মারুতি। কানু এখন সাতটা ধানকলের মালিক। শান্তিনিকেতনে রিসর্ট খুলেছে। ওটা ওর ছেলে দেখে। ছেলেটা বাবার মতো হলো না— এটাই যা দুঃখ কানুর। বড্ড নরম-সরম। একটা জাঁদরেল মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে— ভেবে রেখেছে কানু। গতবছর মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। গরিব ঘরের ছেলে। পছন্দ হয়েছিল কানুর। তুলে এনে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের সঙ্গে। ঘরজামাই করে রেখে দিয়েছে। তিনটে ধানকল

জামাই সামলায়। মেয়েটা বড় হিন্দি সিনেমার পোকা। তা হোক গে, বাপসোহাগি মেয়ে। কানু ওকে একটু বেশিই প্রশ্রয় দেয়।

বছর সাতেক আগে যখন লালপার্টি সরকার থেকে সরে গেল, তখন ছ'মাস কানু চুপচাপ বসে ছিল। কোনোদিকে যায়নি। কিন্তু কানুকে তো সবার দরকার। কানু না থাকলে পার্টি কানা। ভোটটা কানুকেই সামলাতে হয় কিনা। সেই জন্যই কানু ব্যস্ত হয়নি। ছ'মাস পরে এখনকার সরকারি পার্টি কানুর দরজায় কড়া নাড়ল। কানু যেন অপেক্ষাই করছিল। ওর পার্টি অফিসের পতাকার রংটা শুধু পাল্টে গেল। কানু ওর লোকজন নিয়ে কানু ঘোষই রইল। বীরভূমের বেতাজ বাদশা। পাঁচ বছর আগে কানু এই পার্টির হয়ে এম এল এ হয়েছে। ইচ্ছে আছে এবার এম পি হবার। কানুকে এখনও জেলার এস পি সেলাম ঠোকে। ডি এমের ঘরে ঢুকলে ডি এম উঠে দাঁড়ায়। সরকারি টেণ্ডার বেরোলে ঠিকাদাররা আগে ওর বাড়িতে এসেই লাইন লাগায়।

তাই বলে কানুকে কেউ দুশ্চরিত্র বলতে পারবে না। কানু কখনো মেনকাকে ঠকায়নি। দু-হাত ভরে দিয়েছে মেনকাকে। মেনকাও খুব তৃপ্ত। ইদানীং অবশ্য সায়াটিকার ব্যথাটা মেনকাকে ভোগাচ্ছে। মেনকার কাছে এখন কোনো শারীরিক চাহিদাও কানুর নেই। তবু শরীর তো। তাকে তো আর সবসময় বাগে রাখা যায় না। তাই কানু একটা মেয়েমোনুষ রেখেছে। অনেকের যেমন দু-তিনটে থাকে, কানুর তেমন নয়। কানুর একটাই। বছর পঁচিশের মেয়ে। বেশ চটক আছে। বিয়ের বছর দুয়েকের ভিতর বরটা মরে গেছে। বেশি বেশি মদ খেয়ে লিভার পচে মরেছে। একা সোমত্ত মেয়েমানুষকে শেয়াল-কুকুর ঠুকরে খেত। কানু তাকে আশ্রয় দিয়েছে। আমোদপুরের দিকে একটা ভাতের হোটেল করে দিয়েছে। হোটেলের পিছনে একতলা পাকা ঘর। মাঝেসাঝে দু-একটা গয়নাও গড়িয়ে দেয়। কানু মাগনা কিছু নেয় না। হপ্তায় একদিন মেয়েটার কাছে যায় কানু। কানু যখন ওর ঘরে ঢোকে, তখন ভেটকি দরজার সামনে পাহারা দেয়। তা, মেয়েটা খুশিই করে দেয়— মানছে কানু। ওর ঘর থেকে বেরোলে কানুর মনটা ফুরফুর করে। তখন সাঁইথিয়া বাজারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভেটকিকে দিয়ে চারটে গরম রসগোল্লা কিনিয়ে আনে। ডাক্তার যা বলে বলুক, একটা ও নিজে খায়। বাকি তিনটে ভেটকিকে খাওয়ায়। মেনকা এসব জানে। তবে, রাগ করে না। মেনকার তো সায়াটিকার ব্যথা। তাছাড়া, টাকা আছে, ক্ষমতা আছে যার, তার শরীরেরও তো একটা তৃপ্তির দরকার।

আধ বাটি মুড়ি খাওয়া শেষ করে একটু ঠাণ্ডা হলো কানু। জব্বর খিদে পেয়েছিল। এখন নিজেকে একটু সুস্থির লাগছে। মুড়ির বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বাকি মুড়িটা এবার ভেটকি খাবে। মুড়ির বাটি থেকে চোখ উঠিয়ে এবার ভেটকিকে নজর করল কানু। অনেকক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে তা জানতে চায়নি কানু। তখন মুড়ি খাওয়াটা খুব জরুরি ছিল।

— কী হলো? বলবি কিছু?

— আজ্ঞে।

— এতক্ষণ বলিসনি কেন? কী দেখছিলি? আমার খাওয়া?

— আজ্ঞে না। আপনি খাচ্ছিলেন কিনা, তাই...

— ভাসুর ঠাকুর আমার! আমি খাচ্ছিলাম বলে উনি কথা বলতে পারছিলেন না। হারামজাদা বল এবার।

— আজ্ঞে, আপনি বলেছিলেন না, তাই আজকে গোয়ালপাড়ার দিকে গিয়েছিলাম।

— গিয়েছিলি— কানুর চোখ এবার সরু হয়। তা কতক্ষণ ছিলি ওখানে?

— সকালের দিকেই চলে গিয়েছিলাম। তা এই ধরেন গে দশটা-এগারোটা।

— আঃ— বিরক্ত হয় কানু। দশটা আর এগারোটা এক হলো? একঘণ্টার ফারাক। শালা হিসাবটাও জানে না। তা ছিলি কতক্ষণ ওখানে?

— তা এই ধরেন তিনটে অবধি। দুপুরে একটু খিদে পেল। ওই গোয়ালপাড়ার মুখে ঝন্টুর যে দোকানটা আছে সেখানে মাছ-ভাত খেলাম।

— কী খেলে এসব কে জানতে চায়? কত লাগল খেতে?

— আজ্ঞে সত্তর টাকা। আগে ষাট নিত, গতমাসে দাম বেড়েছে। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে ভেটকির দিকে ছুঁড়ে দেয় কানু। ভেটকি ধরতে পারে না। টাকাটা পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে। পরম যত্নে ওটি তুলে ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গি করে টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে নেয় ভেটকি।

— বাজে কথা ছেড়ে এবার বল তোকে যা খোঁজ নিতে বলেছিলাম, সেটা নিয়েছিস তো?

— আজ্ঞে, সেটা নিতেই তো যাওয়া। সারাদিন বসে বসে অনেক খোঁজ নিয়েছি।

— কীরকম?

— গোয়ালপাড়ার লোকেরা বলছে, বট গাছটা ওরা কাটতে দেবে না। বলছে, ঠিকাদারকে বলবে রাস্তা ঘুরিয়ে দিতে। তবু বট গাছ কাটতে দেব না।

— ইল্লি আর কী? বলবে, আর রাস্তা ঘুরিয়ে দেবে। তা বটগাছটা কাটতে দেবে না কেন? ওটা ওদের বাপ-পিতেমোর

সম্পত্তি নাকি?

— কী জানি কী বলছে সব। বলছে ওই গাছে কে নাকি একজন বড় ঠাকুর থাকেন। তার কাছে ওরা মানত করে। তা আমি দেখে এলামও বটে। গাছের ডালে যে কত লাল সুতো বেঁধেছে। বলছে, এ বট কিছুতেই কাটা যাবে না।

— তা আটকাবে কী করে?

— আমিও সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। ভেঙে তো কিছু বলছে না।

— সেটা একটু খোঁজ নে। কী করবে ওরা।

— আজ সন্ধেবেলা নাকি ওই বটগাছের তলায় ওরা মিটিং করবে। সেরকমই শুনে এলাম।

আবার চোখ সরু হয় কানু ঘোষের।

— মিটিং করবে? ঘোঁট পাকাচ্ছে! পারবে কানু ঘোষের সঙ্গে। মেরে পিঠের চাম গুটিয়ে দেব সবকটার। কানু ঘোষ বলছে রাস্তা হবে তো হবে। গাছ কাটা হবে তো হবে।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ভেটকি। বুঝতে পারে কানু ঘোষের মেজাজ চড়ছে।

— তুই যাবি মিটিংয়ে। পিছনে বসে থাকবি। কোনো কথা বলবি না। লুকিয়ে শুনে আসবি কী বলছে ওরা। তারপর আমি দেখছি শুয়োরের বাচ্চাদের।

মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ভেটকি।

এতখানি বলে এবার অফিস ঘরের দিকে পা বাড়ায় কানু। তার পার্টি অফিস বাড়ির লাগোয়া। সকালে সন্ধেয় কানু নিয়ম করে এখানে বসে। পার্টি অফিসের বাইরে সবসময় কুড়ি-পঁচিশটা বাইকের ভিড়। জনা পঞ্চাশেক ছেলে। লোকে বলে, আড়ালে অবশ্যই, কানু ঘোষের দরবার। তা দরবার বলাই যায়। এখানে বসেই কানু সবার আর্জি শোনে। কাউকে যদি কোনো দণ্ড দিতে হয়, এখানে বসেই তা ঘোষণা করে কানু। হপ্তায় একদিন লোকাল থানার ও-সি পর্যন্ত এখানে হাজিরা দিয়ে যায়।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে আবার কী মনে করে কানু ঘুরে দাঁড়ালো। চোখ সরু করে ভেটকির দিকে তাকিয়ে বলল— তোকে আর একটা খোঁজ আনতে বলেছিলাম, সেটার কী হলো?

ভেটকির মুখে একটু সলজ্জ হাসি খেলে যায়। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলে— সে তো দু'দিন আগেই নিয়েছি। আপনাকে বলা হয়নি।

— বলিসনি কেন? এখন বল।

— মাঝে মাঝে একটা লোক যায় বটে টুকির কাছে। দুপুরের দিকে।

—কী রকম লোক?

— একটু খ্যাপা টাইপের। একটা ভাঙা বাইক চালিয়ে আসে। খোঁজ নিয়েছি, ওর একটা গ্রিলের কারখানা আছে।

— তা কী করে গিয়ে?

— কিছুই না। কিসব গল্পটল্প করে। টুকি ওকে ভাত খাওয়ায়। তারপর চলে যায় লোকটা।

— আর?

— মাইরি বলছি আপনাকে। লোকটা কিন্তু কখনো টুকির ঘরে যায়নি। দোকানেই বসে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ভেটকি। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলে— আজ্ঞে, লোকটা কিন্তু ভালো। সাদাসিধা। ওকে কিছু করবেন না। ওকে ছেড়ে দিন।

চোখ সরু করে কী যেন ভাবে কানু ঘোষ। তারপর আচমকাই খ্যা-খ্যা করে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতেই বলে— মেয়েমানুষের কাছে যায়, ঘরে ঢোকে না— অ্যাঁ! ঢোঁড়া সাপ নাকি রে! টুকিকে বলিস ওকে যেন ভালো করে খাওয়ায়। তবে মাংসের ঝোলটা ওকে দেবে। মাংস কিন্তু আমিই খাবো। বলে আর খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। অনেকক্ষণ ধরে হাসে। ভেটকি মাথা নীচু করে কানু ঘোষের হাসি শোনে। তবে একটু নিশ্চিন্তও হয়। যাক বাবা, খ্যাপা লোকটার বিপদ কেটে গেছে। লোকটা কিন্তু সত্যিই ভালো— এ নিয়ে মিথ্যে কিছু বলেনি কানু ঘোষকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একশো টাকার একটা নোট ভেটকির হাতে গুঁজে দিয়ে যায় কানু।

* * *

নবদ্বীপের দোকানে বসে একা একা চা খাচ্ছিল সংঘমিত্রা। একবার সুবর্ণরেখায় যাবে ভেবেছিল। কয়েকটা বই কেনার আছে। কিন্তু এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। চা খেয়ে উঠবে। বাড়ি যাবে। তারপর ধীরে সুস্থে, সন্ধের দিকে ওর চায়ের দোকানটা খুলে বসবে। আজ খুব একটা বেশি ক্লাস ছিল না কলেজে। তাড়াতাড়িই বেরিয়েছে। কী খেয়াল হলো কে জানে, ফেরার সময় রতনপল্লির মুখটায় টোটো থেকে নেমে পড়ল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সোজা এই নবদ্বীপের দোকানে। সবে বিকেল হচ্ছে। এই সময় খদ্দের খুব একটা নেই। একা একা বসেই চা খাচ্ছিল সংঘমিত্রা। সেই সঙ্গে নবদ্বীপের সঙ্গে দু-একটা টুকটাক কথা। বেশ লাগছে আজ বিকেলটা। সুন্দর একটা আলো চারদিকে। কাল মনটা খারাপ ছিল বটে। কিন্তু

তারপর ভালো হয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকেই মনটা ভালো। আজ কলেজে দুটো ক্লাস ছিল। খুব মন দিয়ে পড়িয়েছে। টিচার্স রুমে ইনুদির সঙ্গেও বেশ হেসে হেসে গল্প করেছে। এখন নবদ্বীপের দোকানে বসে চা খেতে খেতেও সংঘমিত্রা বুঝল, মনের ভিতরও আজ রোদ্দুর উঠেছে। তবে, আরও একটা বিষয়ও লক্ষ্য করেছে সংঘমিত্রা। মন খারাপ থাকলে যেমন কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, তেমনই মন খুব ভালো থাকলেও কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তখনও ইচ্ছে করে মন ভালোটা নিয়ে একা একাই থাকি। নিজের সঙ্গেই গল্প করি। সংঘমিত্রা ঠিক করল আজকেও সে কারও সঙ্গে কথা বলবে না। নিজের মনে, একা একা নিজের সঙ্গেই কথা বলবে।

নবদ্বীপের দোকান থকে বেরিয়ে আর টোটোয় উঠল না সংঘমিত্রা। ঠিক করল হেঁটে হেঁটেই গোয়ালপাড়ার মোড় অবধি যাবে, তারপর বাড়ি ফিরবে। অনেকদিন যাওয়া হয় না, আজ ক্যানেলের ধারে দাঁড়িয়ে একটু সূর্যাস্ত দেখবে। মন ভালো থাকতে থাকতেই দেখে নিতে হবে। বলা তো যায় না, আবার কখন মন খারাপ হয়ে যাবে। আসলে ওর মন যে কখন খারাপ হবে, আর কখন ভালো থাকবে, তা সংঘমিত্রা নিজেই বোঝে না। রতনপল্লির মুখে এসে একবার উদয়ন বাড়ির দিকে তাকালো সংঘমিত্রা। বিকেলের আলো পড়েছে উদয়ন বাড়ির বারান্দায়। তার সাদা রঙে বিকেলের আলোয় কমলা ছোপ। বাড়িটাকেও এই সময় দেখতে কী সুন্দর লাগছে। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আবার হাঁটতে শুরু করল সংঘমিত্রা।

আচ্ছা, ওর মন খারাপ হয় কেন? এমন তো নয় ও খুব কষ্টে আছে। ও যেরকম থাকতে চেয়েছিল, সেরকমই তো আছে। ওর থাকায় কোথাও কোনো ছন্দপতন হয়নি তো। তবু মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় কেন? এ প্রশ্নটা ও নিজেই নিজেকে অনেকবার করেছে। তবু, তার কোনো সঠিক উত্তর খুঁজে পায়নি। এখনও হাঁটতে হাঁটতে আরও একবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল— মন কেন খারাপ হয় বলতে পারো কি সেটা?

ওর ভিতর কে যেন একটা বসে ছিল। সে বলে উঠল— মনের খবর আমি কী জানি? সে তো তোমার রাখার কথা ছিল।

— আমি অত খবর রাখতে পারব না বাপু। তোমার জানা থাকলে তুমি বল।

— বলব আমি? শুনবে তো আমার কথা?

— যদি শোনার মতো হয়, শুনবো। তবে কথা দিতে পারছি না।

— এই যে তুমি এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, কী সুন্দর আলো দেখ চারদিকে, গাছপালায় মাঠেঘাটে, ঘণ্টা ঘরের সামনে বাচ্চারা খেলছে— সব কেমন সুন্দর। তাই কিনা বল?

— হ্যাঁ। সুন্দর। সত্যিই খুব সুন্দর সবকিছু।

— মনটা আজ তোমার ভালো হয়ে আছে কিনা, বল।

— হ্যাঁ। ভীষণ ভালো হয়ে আছে। নিজে নিজেই গান গাইতে ইচ্ছে করছে, নাচতে ইচ্ছে করছে।

— আচ্ছা, তা কালকেও তো এরকম আলো ছিল চারদিকে, মাঠেঘাটে, গাছপালায় এরকম আলো তো কালকেও ছড়িয়ে পড়েছিল, কালকেও তো ঘণ্টাঘরের সামনে বাচ্চারা খেলে বেড়াচ্ছিল। তাই কিনা বল?

— হ্যাঁ। তা তো বটেই।

— তবে, কাল তোমার মন খারাপ ছিল কেন?

এবার সত্যিই একটু থতমত খায় সংঘমিত্রা। সত্যিই তো কাল ওর মন খারাপ ছিল কেন? সাতপাঁচ ভেবেও মন খারাপের কোনো কারণ খুঁজে পেল না সংঘমিত্রা। আর তখনই ওর বুকের ভিতর যে মানুষটা বসেছিল, সে খিলখিলিয়ে বলে উঠল— পারলে না তো, পারলে না। তাহলে আমি এবার বলে দিই?

— হ্যাঁ। বল— দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সংঘমিত্রা।

— মনের আর কী দোষ বল? মনও তো লালন চায়। চায় কিনা বল? লালন না করলেই তার মেজাজ বিগড়োয়।

— লালন করব কী করে? সেটাই তো আমি জানি না।

— জানবে, জানবে, সব জানবে। খিলখিলিয়ে ভিতরের মানুষটা বলে উঠল— সময় হলে মনই বলে দেবে কী উপায়ে লালন করতে হয়।

নিজের মনে মনে কথা বলতে বলতেই কখন যেন গোয়ালপাড়ার মুখে পৌঁছে গিয়েছিল সংঘমিত্রা। ক্যানেলের ওপরে পুরনো কালভার্টের পাশে আর একটা নতুন কালভার্ট হয়েছে। আরও চওড়া, আরও বড়। অনেক বেশি গাড়ি যেতে পারে এখন। আসলে এখন অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে। খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গোয়ালপাড়া আর প্রান্তিকের দিকে কত বাড়ি হয়ে গেল। সোনাঝুরির লাল মাটির রাস্তায় পিচ পড়ল। উজ্জ্বল বাতিস্তম্ভ বসে গেল গোয়ালপাড়ার মোড়ে। শহর যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার আগে শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে ক্যানেলের জলে। সোনাঝুড়ির বৃক্ষরাজির ডালে ডালে, পাতায় পাতায়।

সংঘমিত্রা লক্ষ্য করল গোয়ালপাড়ার মুখে যে বুড়ো বটগাছটা তাকে ঘিরে জটলা পাকিয়েছে জনা পঁচিশ-তিরিশ নানা বয়সের পুরুষ-মহিলা। এরা সবাই স্থানীয়। কারোর এখানে চায়ের দোকান, কেউ ভাতের হোটেল চালায়, কেউ পান

সিগারেট বেচে, কারো ছোট্ট মনোহারির কারবার। এদের সবাইকেই চেনে সংঘমিত্রা। ভিড় দেখে তাদের দিকে পায়ে পায়ে এগোলো। বুড়ো বটের তলায় একটা চেয়ার পাতা হয়েছে। আর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ওই জটলাটা উত্তেজিতভাবে কী যেন আলোচনা করছে।

কৌতূহল হলো সংঘমিত্রার। গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল— কী হয়েছে গো তোমাদের এখানে?

— ও মা, দিদি! জানো না কিছু? কিছু শোনোনি?

— না, শুনিনি তো। আসলে কয়েকদিন আসিনি তো এদিকে।

— আমাদের এই বুড়ো বট গাছটা কেটে ফেলবে গো। গাছ কেটে রাস্তা চওড়া করবে।

— গাছ কাটবে? কে? একটু অবাকই হয় সংঘমিত্রা।

— ওই যে কানু ঘোষের লোকেরা। পরশুদিন এসে সব মাপজোক করে গেছে।

— ও মা। তা এবার কী হবে?

— আমরা এ গাছ কাটতে দেব না। এ গাছে আমাদের বড়ঠাকুর আছে।

— কিন্তু আটকাবে কী করে তোমরা?

— সেটা ভেবে বের করতে হবে। এই তো একটু পরেই নতুন পল্লির বুড়ো দাদু আসছে। দাদু এলেই আমরা সবাই মিলে শলা করব। বুড়ো বটকে কাটতেই দেব না।

— পারবে?

— পারতেই হবে দিদি। তুমিও একটু থেকে যাও না। তুমিও দুটো কথা বলবে।

বুড়ো বটের তলায় ভিড় করা মুখগুলোর দিকে অপলক চেয়ে থাকে সংঘমিত্রা। শেষ বিকেলের আলো ওদের মুখেও যে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আলোয় কী এক অত্যাশ্চর্য ভালোবাসা যেন মাখামাখি হয়ে আছে। সংঘমিত্রা ঠিক করল— আজ আর চায়ের দোকান খুলবে না। বুড়ো বটের জটলায় আজ সে-ও একজন হয়েই থাকবে।



।। পাঁচ ।।

কেন আমাদের সুখবিলাসের কথা বলো। সারাদিন মদ খেত। ভ্যান চালিয়ে যেটুকু টাকা পেত মদ খেয়ে উড়িয়ে আসত। আর বাড়িতে এসেই বউকে পেটাতো। কী কষ্টের দিন গেছে বউটার। তা, বউটা এসে একদিন বুড়ো বটের তলায় হত্যে দিয়ে পড়ল। বটের গায়ে মাথা কোটে আর কাঁদে। বলে, বড় ঠাকুর আমার মানুষটাকে ভালো করে দাও গো। গাছের ডালে লাল সুতোও বাঁধল। তা ফল পেল কিনা তোমরা বল? সুখবিলাস মদ খাওয়া ছেড়ে দিল তো। এখন কী সুখের সংসার ওদের। বউটারও কী হাসিমুখ। এতখানি বলে লক্ষ্মী থামে। এই গোয়ালপাড়ার মোড়ে তার মুড়ির দোকান। ভিড়ের দিকে ফিরে চায় লক্ষ্মী। বলে— কী গো তোমরা বলো। আমি কিছু ভুল বলছি কিনা। তোমরাও তো দেখেছো। ভিড়ের ভিতর থেকে সবাই বলে ওঠে— ঠিক, ঠিক, ঠিক। মানত করেই তো ভালো হলো সুখবিলাস। বড়ো করে শ্বাস টানে লক্ষ্মী। তারপর মুখে একটা আবেশ এনে বলে— তা'হলে...

এখন সন্ধে নেমেছে। গোয়ালপাড়ার মোড়ে রাস্তার আলোগুলো একটা একটা করে জ্বলে উঠেছে। আগে রাস্তায় টিমটিমে আলো ছিল। আলো-অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে থাকতো রাস্তাটা। এখন বড়ো বড়ো আলো বসেছে। রাতের বেলায়ও মনে হয় দিনের আলো। বুড়ো বটগাছের নীচে পাতা চেয়ারে বুড়ো বসেছে। বুড়োর বসার জন্যই ঝন্টুর দোকান থেকে চেয়ারটা আনা হয়েছে। বাকিরা সবাই গোল হয়ে বুড়োকে ঘিরে মাটিতে বসে। এত লোকের কথার মাঝেই ঝন্টু এককাপ চা এগিয়ে দিল বুড়োর দিকে। বলল— নাও দাদু, ধর। তোমার জন্যই বানিয়ে আনলাম। চিনি ছাড়া। বুড়ো বটের ঠিক পাশেই ঝন্টুর হোটেল। আগে কাঁচা মাটি আর টালির চালের ছিল। এখন পাকা হয়েছে। সকালে ডিম-পাউরুটি আর ঘুঘনি বিক্রি হয়। দুপুরে ভাত-মাছ। বিকেলে আবার চা আর চপ। বুড়োর দিকে চা বাড়িয়ে দিয়ে ঝন্টু ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল— আমি তা'লে একটা কথা বলি। এই ধর না কেন আমার হোটেলটার কথা। তখন তো হোটেল ছোট ছিল। বাবা বসত হোটেলে। তা বাবা করত কী, রোজ বুড়ো বটের গোড়ায় একটা ধূপ দিত। আর বলত— বাবা, একটু দেখ। তা দেখল তো বাবা! হোটেল তো পাকা হলো। বড়ো হলো। বড়ো ঠাকুর না থাকলে হতো এটা তোমরা বলো? জটলার ভিতর থেকে আবার সমস্বরে সবাই বলে উঠল— ঠিক, ঠিক, ঠিক।

বুড়ো আকাশের দিকে তাকালো। তারাগুলি এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়াও ছুটে আসছে। র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিল বুড়ো। জটলা থেকে সমস্বরে সবাই অনেক কিছু বলে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ধুয়ো দেওয়ার মতো

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

LAUREL

With Best Wishes From-

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Mutual Fund Distributor)

Laurel Investment Advisor

(Investment Advisor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153330 / 41, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

আওয়াজ উঠছে— ঠিকই তো, ঠিকই তো, ঠিকই তো। কাল গোয়ালপাড়ার এই মানুষগুলো গিয়ে বুড়োকে ধরেছিল। বলেছিল— বুড়ো বটকে বাঁচাতেই হবে। বুড়ো বট না থাকলে, কে ওদের ভালো রাখবে? বুড়ো বটকে বাঁচাতে হবে, যে করেই হোক। কিন্তু কী করে বুড়ো বটকে বাঁচাতে হবে, তা ওরা কেউ ভেবে পায়নি। বুড়োও অবশ্য ভেবে পায়নি। কানু ঘোষের অনেক টাকা, অনেক লোক— তার হাত থেকে বুড়ো বটকে বাঁচানো যাবে কী করে ভেবে পায়নি বুড়ো। তখনই ঠিক হয়েছিল আজ সন্ধেবেলা বুড়ো বটের তলাতেই শলা করতে বসবে সবাই মিলে। একটা উপায় ঠিক বেরিয়ে আসবে। বড় ঠাকুরই উপায় বলে দেবেন।

বুড়ো বটের ঝুরি মাটি ছুঁয়েছে। মাটি ছোঁয়া সেইসব ঝুরিতে কত সহস্র লাল সুতো বাঁধা। রোদে বৃষ্টিতে অনেক সুতোর রং উঠে গেছে। শুধু সুতোটাই বোঝা যায়। কত মানুষের কত গোপন ইচ্ছা চিহ্ন এইগুলো। কত যুগ ধরে কত মানুষ এইসব সুতো বেঁধে এসেছে বুড়ো বটের ঝুরিতে। ভেবে তল পায় না বুড়ো। আচ্ছা, মানুষের এইসব ইচ্ছা হয় কেন? সবসময় যে সব ইচ্ছা পূরণ হয় তা তো নয়। তবু মানুষের আবার নতুন নতুন ইচ্ছা হয়। কেন হয়? ভেবে ভেবে কোনো উত্তর পায় না বুড়ো।

ভিড় থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল ভেটকি। রাস্তার আলো একটু আড়াল করে। মুখটা ভালো করে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। যাতে চট করে ঠাহর করা না যায়। দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কান খাড়া করে শুনছিল জটলা থেকে ভেসে আসা কথাগুলো। আর ফুক ফুক করে বিড়ি খাচ্ছিল। এই জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কানু ঘোষের পায়ে পায়ে ঘুরে কেটে গেল। স্রেফ উঞ্ছবৃত্তি। আড়ালে যে লোকে ওকে বাবুর বাড়ির অ্যালসেশিয়ান বলে তা ভেটকি জানে। সেটা শুনতে কি ভালো লাগে ভেটকির! মোটেই না। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ভেটকির এই উঞ্ছবৃত্তি ছেড়ে চলে আসবে। আর যাবে না কানু ঘোষের বাড়িতে। আর এরকম চাদরে মাথা মুড়িয়ে আড়ি পাততে আসবে না। কানু ঘোষের বাঁধা মেয়েমানুষের ঘরে কোন পুরুষ আসে লুকিয়ে সে খবরও নিতে যাবে না। এসব ভাবে, কিন্তু ছেড়ে আসতে পারে না। ছেড়ে যাবে কোথায়? ভেটকি তো এছাড়া কোনো কাজ করতে শেখেনি। তাছাড়া কানু ঘোষ তো তার অন্নদাতা। মাঝে মধ্যেই তার হাতে দু-দশ টাকা গুঁজে দেয় তো। এ বাদে এধার ওধার থেকে কানুর নাম করে কিছু টাকা কামানোও তো আছে। ভেটকির বউ এসব পছন্দ করে না। কতবার বলেছে, এবার এসব বাদ দাও। একটু ভদ্রভাবে বাঁচো দেখি। ভেটকি বলতে পারেনি, মানুষের সব ইচ্ছাই কি পূরণ হয় রে বউ?

অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভেটকির মনে পড়ে গেল, তারও তো কতগুলি ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছাগুলি কোনোদিন ফুল হয়ে ফুটে উঠল না। ভেটকির বউ কতদিন বলেছিল, কঙ্কালী মাকে একটা ভালো শাড়ি পরিয়ে আসবে। আর দশ-বিশজন ভিখারিকে নারায়ণসেবা করাবে। বউয়ের সে ইচ্ছা ভেটকি রাখতেই পারলো না এতদিনেও। ভেটকির ইচ্ছে ছিল, মেয়েকে একটা ইংরেজি বলা স্কুলে পড়াবে। তার মেয়েও সাদা জামা পরে হাসতে হাসতে ইংরেজি বলা স্কুলে যাবে— এমনই কতদিন ভেবেছে ভেটকি। ভেটকির এই ইচ্ছাও পূর্ণ হলো না। ভেটকি ভেবেছিল, ওরও একদিন একটা একতলা পাকা বাড়ি হবে। সামনে একটু উঠোন। লাউমাচা। বেস্পতিবারে বউ লক্ষ্মীপুজো করবে। আর ভেটকি যখন বাড়ি ফিরে আসবে, তখন বউ জল-বাতাসা এগিয়ে দিয়ে বলবে— আজ বড়ো পরিশ্রম গেল, না গো? জটলার কথা কান পেতে শুনছিল আর ভেটকির মনে হচ্ছিল, ওর বউ-ও যদি বুড়ো বটের ঝুরিতে একটা লাল সুতো বেঁধে দিয়ে যেত। কিন্তু সে উপায় আর নেই। আর ক'দিন পরেই বুড়ো বট কাটা পড়ে যাবে। যদি বুড়ো বট কাটা না পড়ত, যদি আরও অনেকদিন বুড়ো বট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো— তবে নিশ্চয়ই ভেটকি তার বউকে বলত, একটা লাল সুতো বেঁধে মানত করতে। বুড়ো বটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে বউ বলত— বড় ঠাকুর, এবার এই উচ্ছন্ন লোকটাকে একটু মানুষ করে দাও। তা অবশ্য আর কোনোদিন হবে না— জানে ভেটকি।

জটলার ভিতর গলার স্বর ক্রমশ বাড়ছে। আলাদা করে বুড়ো আর কারুর কথা শোনে না। একটা গুঞ্জন শুধু মাথার ওপর ভেসে বেড়ায়। বুড়ো বটের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়ায় সে গুঞ্জন। বুড়োর কানে আলাদা করে আর কোনো কথা ঢোকে না। আকাশের দিকে তাকায় বুড়ো। ঘন কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটেছে আজ। কাল মাঘোৎসব। উপাসনা মন্দির মোমবাতির আলোয় সেজে উঠবে। মাঘোৎসবের দিনটিতে বুড়ো সন্ধে নামতে না নামতেই আম্রকুঞ্জে অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে বসে থাকে। ভিড়ের ভিতর যায় না। উপাসনা মন্দির থেকে উপনিষদের বাণী ছড়িয়ে পড়ে শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণে। স্তব্ধ হয়ে বসে শোনে বুড়ো। একসময় মাঘোৎসবের উপাসনা শেষ হয়। যে যার মতো ঘরে ফিরে যায়। সবার শেষে বুড়ো ফেরে। একা। তারপর রাতভর তার নির্জন বাড়িটিতে বসে শিরিষ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে

যায়। ওরা সে গল্প শোনে। আদর করে বুড়োকে। এসবই ঘটে সকলের অন্তরালে। বুড়ো কাউকে একথা কোনোদিন বলেনি।

আচ্ছা, ওর নিজের কি কোনোদিন কোনো ইচ্ছে ছিল? বিশেষ ইচ্ছে? যা আজ অবধি পূর্ণ হয়নি। ভেবে তল পায় না বুড়ো। কোনো বিশেষ ইচ্ছের কথাই তার মনে পড়ে না। এই বুড়ো বটের তলায় তাকে ঘিরে যারা বসে আছে, তাদের কতজনের তো কতরকম ইচ্ছে। কারো ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে, অনেকের ইচ্ছেই পূর্ণ হয়নি। তবু আজ, এই জানুয়ারির শীত সন্ধ্যায় অপূর্ণ ইচ্ছেগুলিকে ছাপিয়ে পূর্ণ ইচ্ছেগুলিই যেন বড় হয়ে ওঠে। যাদের কখনোই, কোনো ইচ্ছেই পূর্ণ হয়নি— তারাও যেন আবার নতুন নতুন ইচ্ছে নিয়ে বাঁচতে চায় আজ। বুড়োর মনে হয়, এটাই আসলে মানুষের বেঁচে থাকা।

ও দাদু, দাদু, এবার তুমি কিছু বলো— ঝন্টুর ডাকে চটকা ভাঙে বুড়ো। আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে এবার জটলার দিকে তাকায়। জটলায় জড়াজড়ি করে অনেক মেয়েপুরুষের মুখ। আলাদা করে কাউকেই আর চেনা যায় না এখন। এক মুখ যেন সবার, একই কণ্ঠস্বর। জটলার দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলে— তা কী করতে চাও তোমরা?

— কী আবার? এতক্ষণ তো বললাম আমরা। বুড়ো বটকে কাটতে দেবো না। কিছুতেই না। সমস্বরে বলে ওঠে জটলার মেয়েপুরুষরা।

— সে তো বুঝলাম। কিন্তু আটকাবে কী করে? কানু ঘোষের অনেক পয়সা, অনেক লোক। পুলিশও কানু ঘোষের কথা শোনে। পারবে কানু ঘোষের সঙ্গে?

জটলার গুঞ্জনটা এবার থমকে যায়। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। আসলে বুড়ো বটকে বাঁচাবে কী করে— সেটা ওরা কেউই ভেবে পায়নি। দু'দিন ধরে বুড়োও খুব ভেবেছে। কিন্তু ভেবে কোনো উপায় বের করতে পারেনি। জটলার থেকে একটু দূরে থাকা ভেটকির কানেও গেল বুড়োর কথাটা। মোক্ষম বলেছে বুড়ো। এক কথায় সবাই চুপ। কারও মুখেই আর কোনো উত্তর নেই। তা বুড়ো কথাটা খুব ভুল বলেনি বটে— ভাবল ভেটকি। আজকে এখানে আসার আগেই ভেটকি দেখে এসেছে কানু লোকজন ডেকে পাঠিয়েছে। ষণ্ডাগুন্ডা সব ছেলে। বাইক চালায়, হাতে বালা। গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় বুথ দখল করল। তাদের যা বলার বলে দিয়েছে কানু। দু-তিনদিনের ভিতর ওরা দল বেঁধে চলে আসবে। এখানে সব দোকানপাট ভাঙচুর করবে। চাই কি, মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে একটু হাতের সুখও করে নেবে। বুড়ো বটগাছটাও কেটে দেবে। কিচ্ছু করতে পারবে না গোয়ালপাড়ার লোকগুলো। এতক্ষণে এই লোকগুলোর জন্য ভেটকির একটু মন খারাপ লাগতে শুরু করে। আর ভাবে, আগে জানলে বউটাকে একবার বলতো, বুড়ো বটে একটা লাল সুতো বেঁধে দিয়ে যেতে।

— আমার একটা কথা বলার ছিল— বলে মিলন উঠে দাঁড়ায়। জটলার সবকটি মুখ উৎসুক হয়ে মিলনের দিকে তাকায়। মিলন একটা উদোমাদা চণ্ডীচরণ। সবাই জানে। তবু মিলন কী বলে জানে, জানতে চায় সবাই।

— তা'লে বলি আমার কথাটা?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল, বল। ভ্যানতাড়া করো না এখন। জটলার ভিতর থেকে অধৈর্য গলায় কে একজন বলে ওঠে।

— আমি বলছিলাম কি, কানু ঘোষের অনেক লোক। অনেক পয়সা। আমরা পারবো কেমন করে? কিনা, তাই বল—

— আরে বাবা, সে তো আমরা জানি। নতুন কিছু বলার থাকলে বলো না— জটলার কণ্ঠস্বর ক্রমশ অধৈর্য হয় এবার।

— আমি বলছিলাম, এই বুড়ো বটকে জড়িয়ে আমরা সবাই যদি বসে থাকি। সারাদিন, সারারাত। ঘিরে বসে থাকি বুড়ো বটকে। যদি আগলে রাখি তাকে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জটলার দিকে তাকায় মিলন। তার কথা মেনে নেবে কি সবাই?

মিলনের কথার পর জটলাতে আবার একটা নীরবতা নেমে আসে। ফিসফাস করে পরস্পর কী যেন আলোচনা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে, জটলার ভিতর থেকে ক্ষয়াটে চেহারার এক মাঝবয়সি মানুষ উঠে দাঁড়ায়। গলা খাকারি দিয়ে বলে— তা বুঝলে সবাই, মিলন খুব একটা খারাপ বলেনি। বুড়ো বটকে ঘিরে আমরা সবাই বসে থাকি না কেন। আজ রাত থেকেই। ওকে বাঁচাতে পারবো কি, পারবো না জানি না। কিন্তু যে ক'টা দিন রয়েছে, ওকে ঘিরে থাকি না কেন। কী বল হে সবাই?

দূরে দাঁড়িয়ে ভেটকি অবাক হয়ে শুনছিল। ওই ন্যালাখ্যাপা ম্যাদামারা লোকটা তো মোক্ষম বলেছে। ওই লোকটাই তো ঝরঝরে বাইক চালিয়ে টুকির কাছে যায়। আজকের কথাটা যদি কানুর কানে যায়, তাহলে মেরেই ফেলবে লোকটাকে। টুকির ঘরে না ঢুকেও বেঘোরে মরে যাবে লোকটা। তবে, রক্তারক্তি কাণ্ড একটা কিছু ঘটে যাবেই— তা বুঝতে পারে ভেটকি। কানু ঘোষের লোকেরা এসে এদের ছেড়ে দেবে না।

কী সুন্দর বলল মিলন। ভাবে বুড়ো। সকলে মিলে ঘিরে বসে থাকা এই গাছকে। ঘিরে ঘিরে বসে থাকা। আদরে-আহ্লাদে জড়িয়ে রাখা তাকে। মিলন সত্যিই গাছের ভাষা বুঝেছে। জটলার দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল— মিলন কিন্তু ভালো বলেছে। ওর কথাটা মেনে নাও সবাই। আজ রাত থেকেই বুড়ো বটকে ঘিরে বসে পড় মেয়ে-পুরুষ সবাই। দিনরাত সবসময়।

হাত দিয়ে এই বুড়ো বটকে ছুঁয়ে থাকো।

জটলার ভিতর থেকে সাড়া মিলল। গাছকে ঘিরে বসে পড়ার হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। যারা গাছের ডালে লাল সুতো বেঁধেছিল তারা তো বসলই, যারা বাঁধেনি তারাও বসল। যেন আপনজনকে আগলে রাখছে সবাই।

এতক্ষণ সবটা চুপ করে দেখছিল সংঘমিত্রা। আজ সারাদিন ওর মনটা বড়ো ভালো হয়ে আছে। কোথাও যেন একটা খুশির হাওয়া বয়ে আসছে ওর মনের ভিতরে। জটলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওরও এখন কিছু বলতে ইচ্ছে করল। বুড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল— দাদু, আমি কি কিছু বলতে পারি?

— বল না। এখানে সবাই সবকিছু বলতে পারে। মনের কথা বলতে পারে।

— কাল তো উপাসনা মন্দিরে মাঘোৎসব। আজ এখান থেকেই আমরা মাঘোৎসব শুরু করে দিই না কেন। বটগাছটাকে ঘিরে আমরা মোমবাতি জ্বালাই, প্রদীপ জ্বালাই। ওকে ঘিরে বসে আমরা গান গাই। কত রকমের গান। উপাসনা মন্দিরের উপাসনা যেমন ছড়িয়ে পড়ে ছাতিম তলায়, আম্রকুঞ্জে, আমাদের গানও আজ ছড়িয়ে পড়ুক গোয়ালপাড়ায়, সোনাঝুরিতে, কোপাইয়ের তীরে।

অবাক হয়ে তাকায় বুড়ো। মেয়েটা বলছে কী! নিজের ভিতর আছে তো! বুড়োর মনে হলো, মেয়েটা যেন ঘোরের ভিতর কথা বলে চলেছে। আজ কি নিশিতে পেল সবাইকে? ঘোর লাগল সবার? ভাবে বুড়ো।

সংঘমিত্রার কথা শেষ হলো না। পাশের মনোহারি দোকান থেকে কে যেন ছুটে গিয়ে এক প্যাকেট মোমবাতি কিনে নিয়ে এলো। জটলার ভিতর থেকেই কেউ প্যাকেটটা এগিয়ে দিল সংঘমিত্রার দিকে। বলল— প্রথমটা আপনি জ্বালান দিদি। কে যেন হাঁক মেরে বলল— ওরে, দেশলাইটা দে। বুড়ো বটকে ঘিরে হাতে হাতে মোমবাতি জ্বলে উঠল। যেন আলোর মালা। বুড়ো সংঘমিত্রার দিকে তাকিয়ে, স্মিত হেসে বলল— এবার গানটা ধর। আমাদের আলোর উৎসব শুরু হোক। সব অন্ধকার দূর হোক।

কিছুক্ষণ তারাভরা আকাশের দিকে আপলক তাকিয়ে থাকে সংঘমিত্রা। তারপর আপন মনেই, যেন ধ্যানস্থ, চোখ বুজে গেয়ে ওঠে— 'আমার এই রিক্ত ডালি, দিব তোমারই পায়ে...'। বুড়ো বটের ডালপালা ছাড়িয়ে, গোয়ালপাড়ার মাঠঘাট ছাড়িয়ে, সোনঝুরির জঙ্গল পেরিয়ে ঈশ্বরের আকাশে খেলে বেড়াতে লাগল সেই সংগীত। অপার্থিব। মোহময়।

গোড়া থেকেই জটলার একদম পিছনে বসে ছিল অরণ্য। কোনো কথা বলেনি। শুধু গোয়ালপাড়ার লোকগুলোর কথা শুনছিল আর ওদের কাণ্ড কারখানা দেখছিল। অরণ্যর বসে থাকার অন্য একটা কারণ ছিল অবশ্য। অরণ্য ভেবেছিল, এইসব ভিড়ভাট্টা কমলে ও বুড়োকে ধরবে। সরাসরি জানতে চাইবে, সেদিন বুড়ো যে ম্যাজিক আলোর কথা বলেছিল, তা কি সত্যিই নেমেছিল পৃথিবীতে? নাকি তা ছিল নিছকই বিভ্রম। এখন সংঘমিত্রার গান শুনতে শুনতে কী এক অদ্ভুত লজ্জা পেয়ে বসল অরণ্যকে। ওর বুক ধুকপুক করতে লাগল, গলা শুকিয়ে উঠল। আর চোখ তুলে তাকাতেই পারল না অরণ্য।

রাত বাড়ল ক্রমে। বুড়ো বটকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে মেয়ে-পুরুষ সবাই। মোমবাতি নিভে গেলে আবার নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কারা আবার যেন বাড়ি থেকে প্রদীপ এনেও জ্বালিয়ে দিয়েছে। আজ রাতভর ওরা এরকমভাবে বসে থাকবে। কাল থাকবে। পরশুও। যতদিন এই বুড়ো বট থাকবে। তাকে ঘিরে রাখবে ওরা।

বাড়ি ফিরতে হবে। বুড়ো এবার উঠে দাঁড়াল। আর তখনই বুকের বাঁদিকে একটা ব্যথা ঝিলিক দিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল।

* * *

আজ সত্যি সত্যি পারুলের খুব চিন্তা হচ্ছে। বাড়ি ফিরতে এত রাত কখনো করে না লোকটা। টিভিতে রাত আটটার সিরিয়ালটা যখন শুরু হয়, তখনই ফিরে আসে। আজ আটটার সিরিয়ালটা শেষ হয়ে গেল। ন'টার সিরিয়ালও শুরু হয়েছে। এখনও আসার নাম নেই লোকটার! গ্রিলের কারখানার একটা মিস্ত্রিকে পাঠিয়েছিল খোঁজ করতে। সে ঘুরে এসে বলেছে, গোয়ালপাড়ার মোড়ে বুড়ো বটকে ঘিরে সবাই বসে আছে। ওর মধ্যে লোকটাও আছে। আবার মোমবাতিও নাকি জ্বালিয়েছে। এসব শুনে বুক কাঁপে পারুলের। পারুলের জগৎ এই বাড়ি আর বাড়ির পাশের কারখানা। এর বাইরে খুব একটা বেরোয় না পারুল। তবু সব খবর পায়। গ্রিলের কারখানার মিস্ত্রিরাই সব খবর এনে দেয়। কতবার ভেবেছে, লোকটাকে বলবে বোলপুরের হলে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে। তা বলবে কাকে? সারাদিন নিজের ভাবেই থাকে লোকটা। বাইক নিয়ে আদারেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এমন লোক পারুলের মন বুঝলে তো! কিন্তু আজ পারুলের বুকটা একটু একটু কাঁপছে। কানু ঘোষ বুড়ো বট কেটে রাস্তা চওড়া করতে চায় পারুল শুনেছে। কানু ঘোষ লোক ভালো নয়। করবে যখন বলেছে, তখন যে কোনো উপায়ে করবেই। পঞ্চায়েত ভোটে কী

কাণ্ডটাই না করল। তার সঙ্গে আগবাড়িয়ে কেউ লড়তে যায়? এ তো জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা। এসব লোকের সঙ্গে অনেক গুন্ডা-বদমাশ থাকে। তারা রাতের বেলায় হামলা করে। মেয়ে বউদের ছাড়ে না— জানে পারুল। উঠে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো তারা মায়ের ছবিতে তিনবার মাথা ঠোকে পারুল। আঁচল দিয়ে চোখের কোণের জলটা একটু মুছে নেয়।

গোয়ালপাড়ার লোকেরা গেছে, গেছে। তা বলে এই লোকটার আগ বাড়িয়ে কী দরকার ছিল বুড়ো বটের তলায় বসে পড়ার। বুড়ো বটের ডালে পারুলও তো লাল সুতো বেঁধেছিল। হলো ওর খোকা? হলো না তো। তবু এই লোকটার বুড়ো বটের তলাতেই বসে পড়া চাই। এসব ন্যাকামি দেখলে একটু রাগও হয় অবশ্য পারুলের। অথচ খোকা হবে বলে পারুল কতকিছুই না করেছিল। বাচ্চার গরম জামা কিনেছিল, ছোট ছোট মোজা, লাল টুপি, খেলনা। খোকা হলো না। সেসব অনেকদিন পারুল তুলে রেখেছে তোরঙ্গতে। ফেলে দিতে পারেনি অবশ্য। তা বলে এখন আর খামোকা মন খারাপ করে না। এখন পারুল মন দিয়ে গ্রিলের কারখানা সামলায়। আর মাঝে মাঝে তোরঙ্গ থেকে বের করে ওই লাল টুপি আর গরম জামা রোদে দেয়।

ঘড়ি দেখল পারুল। সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। সারারাত ওই বুড়ো বটের তলায় কাটাবে কিনা কে জানে! এ লোকের কোনো বিশ্বাস নেই। এ সব পারে। রোজ এতক্ষণে এসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। রাত জাগতে পারে না। যদি সারা রাত ওখানে থাকে কী করবে কে জানে! হয়তো ঘুমেই ঢলে পড়বে। হিম পড়বে সারা রাত শরীরে। একটা অসুখবিসুখ বাঁধাবে। বিরক্ত লাগতে থাকে পারুলের।

লোকটার কোনো শখ আহ্লাদ আছে কিনা, আজ অবধি বুঝতে পারল না পারুল। রোজ বাড়ি ফিরে এসে খেতে বসে একমনে খেয়ে যায়। ভালোমন্দ কোনোকিছুই বলে না কোনোদিন। এমনকী, খিদে পেলেও মুখ ফুটে কোনোদিন খাবার চায়নি। জামা-কাপড়গুলোও কতদিনের পুরনো হয়ে গেল, রং চটে গেল— তবু একজোড়া নতুন জামাপ্যান্ট কিনবে না। বললেই এড়িয়ে যাবে। অথচ এখন এ সংসারে তো কোনো অভাব নেই। এসব ভুলোভালা লোকের সঙ্গে সংসার করা চলে না। কেন যে মরতে এ লোকটার সঙ্গে বিয়ে হলো— এখন ভাবে পারুল। তারপরই মনে হয়, এ মানুষটা তো শিশুর মতো। রাতে যখন ঘুমিয়ে থাকে, একটু গুটিশুটি মেরে, হাতটা মাথার তলায় রেখে— তখন শিশুই তো মনে হয় একে। মায়া হয় পারুলের। ভালোবাসে কিনা জানে না, তবে এই শিশুটিকে ছেড়ে যাওয়ার কথা পারুল কখনো ভাবতে পারে না। জানে, একে ছেড়ে চলে গেলে, বড়ো অযত্নে নষ্ট হয়ে যাবে লোকটা। সবাই তো একরকম হয় না, থাক এই লোকটা এরকমই। বুক ভরে একটা শ্বাস নিয়ে ভাবে পারুল।

দেখতে দেখতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। পারুলের বুকের ভিতর কাঁপুনিটা এবার বেড়েছে। একটা টর্চ হাতে বাড়ির বাইরে বেরল পারুল। গোয়ালপাড়ার দিকে যাবে এবার।



।। ছয়।।

— আর একটু ভাত দিই।

— নাহ, থাক। এমনিতেই বেশি হয়ে গেছে। এরপর আবার বাইক চালিয়ে ফিরতে হবে তো।

ডিমের ঝোল দিয়ে ভাতটা মাখতে মাখতে বললো মিলন। টুকি ডিমের ঝোলটা বেশ রান্না করে। অল্প রসুন দেয়। এই রসুনের গন্ধটাই বেশ লাগে মিলনের।

— খেয়ে উঠেই বাইক চালানোর কী দরকার! একটু বসেটসে তারপর যাও না হয়।

— তা হবে না। আজ রতনপল্লিতে গ্রিলের অর্ডারটা নিতেই হবে। দু'দিন যাইনি।

মিলনকে বেশ লাগে টুকির। কোনো চাহিদা নেই মানুষটার। এমনকী, নিজের কাছেও তো নিজের কিছু চাহিদা থাকে সবার। এর যেন তাও নেই। যা পাই তাই সই। মিলনের ঘরে একটা বউ আছে। জানে টুকি। অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে মিলনের বাড়ি গিয়ে ওর বউয়ের সঙ্গে আলাপ করে আসবে। কিন্তু যেতে পারেনি। কিছু যদি ভাবে মিলনের বউ। মাঝে মাঝে ভাবে, মিলন যে মাঝেমধ্যেই তার কাছে চলে আসে, কিছুক্ষণ বসে, গল্প করে। তারপর ভাতটাত খেয়ে চলে যায়, সে কি ওর বউ জানে? জানে বোধহয়— না, জানলে কি মিলন আর এরকম নিশ্চিন্তে এখানে ভাত খেয়ে যেতে পারে? মিলনকে টুকি চেনে মাত্র দু'বছর। দু'বছর আগে একদিন দুপুরে মিলন রাস্তায় বাইক দাঁড় করিয়ে এখানে ভাত খেতে ঢুকেছিল। ভাতটাত খেয়ে পকেট থেকে একগাদা খুচরো বের করে বলেছিল, আমি তো

হিসাব বুঝি না, তুমি এখান থেকে বুঝেশুনে নিয়ে নাও। এরকম খদ্দের বাপের জন্মেও কোনোদিন দেখেনি টুকি। তাই অবাক হয়ে মিলনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মুখ টিপে হেসে বলেছিল— তা আপনার হিসাব বোঝে কে? মিলনের হাত থেকে পয়সা গুনে নিতে টুকি আবার জিজ্ঞেস করেছিল— ক'বছর বিয়ে হয়েছে?

— এই হবে গো। বেশ কয়েক বছর।

— বাচ্চা কাচ্চা?

— নেই।

— অ। এই হিসাবটা বুঝি বউ বুঝে নিতে পারেনি।

কোনো উত্তর দিতে না পেরে মিলন চুপ করে তাকিয়েছিল। অবাক হয়েই।

— অমন করে কী দেখছেন আমাকে? আমি এই ভাতের হোটেলটা চালাই। আমি টুকি। তা আপনি কী করেন? কোথা থেকে আসছেন এদিকে?

— আমি? থাকি তো সেই তালতোড়ের দিকে। গ্রিলের একটা কারখানা আছে। ও বউ-ই দেখে। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এদিক-সেদিক।

— এদিকে কার কাছে এসেছিলেন?

— কারো কাছে না। ওই যে হাইওয়ের ধারে মাঠটা আছে, ওখানে শুয়েছিলাম। তারপর খিদে পেল। চলে এলাম।

আরও অবাক হওয়ার পালা টুকির। এ লোকটা বলে কী? এ কি পাগল? মাঠে শুয়ে ছিল, তারপর খিদে পেল আর চলে এল। এরকম খদ্দের টুকির এখানে আগে আর আসেনি। মিলন যখন বাইকে উঠে স্টার্ট দিয়েছে, তখন টুকি গলা চড়িয়ে বলেছিল— এদিকে এলে আবার আসবেন কিন্তু আমার হোটেলে।

কথা রেখেছিল মিলন। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই আসে এখানে। টুকি খদ্দেরদের জন্য রান্না করে। আর মিলন পিছনে বসে আপন মনে বকে যায়। কত কথা বলে, সব কথার মানেও বোঝে না টুকি। শুধু এটুকু বোঝে, এই লোকটা এই সংসারে বড় বেমানান। এর জন্য কোনো সংসার তৈরি হয়নি। প্রথমদিনই মিলনের কাছ থেকে ডিমভাতের দাম নিয়েছিল টুকি। তারপর আর কোনোদিন নেয়নি। তবে এখন পরপর বেশ কয়েকদিন মিলন না এলে টুকি আনমনা হয়ে পড়ে। বারবার রান্না ফেলে ঘরবার করে। মন বসে না যেন কিছুতেই। আর যেদিন যেদিন এমন হয়, সেদিন সেদিন মাছের ঝোলে নুন দিতে ভুলে যায়, পোস্তর তরকারিতে বেশি ঝাল দিয়ে ফেলে। তবে এটাও ঠিক, মিলন আজ পর্যন্ত কোনোদিন টুকির ঘরে যেতে চায়নি। তবে,



মিলন এখন টুকিকে 'তুই' করে বলে, আর টুকি 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' এসেছে।

এত কম কম খাও কেন? আর একটু ভাত দিই। পেট ভরে খাও। ডিমও দিই আর একটা?

— না, না, একদম দিবি না। অত খাওয়ার এখন সময় নেই।

আলাপ হওয়ার পর প্রথম ক'দিন তুমি তুমি করে বলতো মিলন। ধীরে ধীরে 'তুই'তে নেমেছে। তবে মিলন যখন ওর নাম ধরে ডাকে, বেশ লাগে টুকির।

— কী এমন রাজকাজ তোমার? একটু ধীরে ধীরে পেট ভরে খেয়ে যেতে পারো না?

— সে অনেক কাজ। ও তুই বুঝবি না।

— না, আমি কিছু বুঝব না। সব বুঝবেন উনি। কপট রাগের ভঙ্গি করে টুকি।

— বললে বুঝবি তুই? খেতে খেতেই টুকির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে মিলন।

— বলেই দেখ না, বুঝি কি না।

— এখান থেকে গিয়ে আমাকে এখন গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বটগাছের তলায় বসতে হবে।

— ও মা, এ আবার কেমন ধারা কথা? এই দুপুরবেলায় সব ছেড়েছুড়ে বটগাছের তলায় বসতে হবে কেন?

— বলেছিলাম তো তুই বুঝবি না।

— আহ্, বুঝিয়ে বললে তো বুঝব। এবার রাগের ভঙ্গিমা করে টুকি।

— বুড়ো বটকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের। ও না বাঁচলে আমরা কী নিয়ে থাকব বল তো! কাল রাত থেকেই আমরা বুড়ো বটকে ঘিরে বসে আছি। তাকে জড়িয়ে রয়েছি। তার ফাঁকেই একবার তোর সঙ্গে দেখা করে গেলাম। এখন তো আর চট করে এদিকপানে আসা হবে না।

মিলনের কথার কোনো অর্থই বুঝে পায় না টুকি। কী চায় মিলন সেটাই বোঝে না। অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে— হঠাৎ কী হলো? বটগাছ বাঁচাতে সবাই মিলে নেমে পড়লে কেন?

— না নেমে উপায় আছে? নইলে বুড়ো বটকে কেটে দেবে যে। কেটে রাস্তা চওড়া করবে।

— তা কাটলে কাটবে। তা নিয়ে তোমাদের এমন পাগলামি কেন?

— কী বলিস তুই টুকি! কাটতে এলেই কাটতে দেব? আটকাবো না? এই বুড়ো বটটার জন্যই তো আমরা বেঁচে থাকি। স্বপ্ন দেখি। এই যেমন, পারুল স্বপ্ন দেখেছিল ওর একটা খোকা হবে। বুড়ো বট খোকা দেয়নি বটে, কিন্তু স্বপ্নটা তো রয়ে গেছে। আমাদের সবার একটা একটা করে স্বপ্ন আছে জানিস। বুড়ো বট না থাকলে সে স্বপ্নগুলোও যে থাকবে না।

একটু থামে, তারপর আচমকাই টুকিকে জিজ্ঞেস করে— তুই কোনো স্বপ্ন দেখিস টুকি?

আচমকা এরকম প্রশ্নে টুকি একটু থতমত খায়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে— কী জানি, জানি না। আমার এসব পাগলামি করলে চলে?

ভাত খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল মিলনের। মাথা নীচু করে থালায় আপন মনে কীসব আঁকিবুকি কাটছিল। সেইদিকে তাকিয়ে নরম সুরে টুকি জিজ্ঞেস করল— তা, কে গাছটা কাটবে শুনি?

— কানু ঘোষ।

এক মিনিটের নিস্তব্ধতা যেন। তারপর টুকি আবার বললো— কানু ঘোষের কিন্তু অনেক লোক। অনেক গুণ্ডা। পারবে তোমরা কানু ঘোষকে আটকাতে? ও ঠিক গাছ কেটে দেবে।

— না পারি তো না পারব, তবে যতদিন পারি গাছটাকে জড়িয়ে ধরে তো বাঁচি আমরা।

মিলন উঠে হাত ধুতে যায়। তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে টুকি। জীবনে এমন কোনো দ্বিতীয় পুরুষকে দেখেনি সে। মানুষটা হিসাবে জানে না। ভরদুপুরে চিত হয়ে মাঠের মাঝে শুয়ে আকাশ দেখে। এখন বুড়ো বটগাছকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকবে। এই মানুষটার তল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বাঁচুক, মানুষটা এভাবেই বেঁচে থাকুক। আর মাঝে মাঝে তার ভাতের হোটেলে এসে ডিম-ভাত খেয়ে যাক।

মুখ ধুয়ে আসে মিলন। দুটো মৌরি ওর হাতে ঢেলে দেয় টুকি। বলে— সাবধানে যেও, আর অত চিন্তা করো না।

— সে যাবখ'ন। এখন আর ক'দিন তোর কাছে আসতে পারবো না। বুড়ো বটকে ঘিরে দিনরাত এক করে বসে থাকতে হবে।

— আসবে, আসবে। ক'দিন পরেই আসবে দেখ। মুচকি হেসে বলে টুকি।

— তুই কী করে জানলি? গাছটা কবে কাটতে আসে তার কোনো হিসাব নেই?

কী যেন ভাবে টুকি। তারপর বলে— ও গাছ কেউ কাটতে পারবে না। গাছ ঠিক বেঁচে যাবে, দেখ।

— বেঁচে যাবে? কানু ঘোষ গাছ না কেটে যাবে না।

— বলছি তো পারবে না ও গাছ কাটতে। গাছ ঠিক বেঁচে যাবে।

টুকির কথাটা যেন এবার একটু কঠোর শোনায়। অবাক হয়ে টুকির মুখের দিকে তাকায় মিলন।

— কী করে জানলি তুই?

— আমি ঠিক জানি। সব তোমায় বলতে হবে নাকি?

— একবার শুধু বল। আমি নিশ্চিন্ত হই।

— ও আমাকে স্বপ্নে ইচ্ছাময়ী ঠাকরুন বলেছে। ও গাছ কেউ কাটতে পারবে না। বলে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে টুকি।

কিছুটা হতভম্ব হয়েই বেরিয়ে আসে মিলন। বাইকে স্টার্ট দিয়ে হাইওয়ের দিকে রওয়ানা দেয়। আপন মনেই ভাবে— কী যেন একটা বলল টুকি? ইচ্ছাময়ী ঠাকরুন? কই এরকম কোনো দেবীর নাম তো কোনোদিন শোনেনি মিলন। এ দেবীর নাম টুকি শুনলো কোথায়? ভাবে, ভেবে কোনো উত্তর না খুঁজে পেয়ে মিলন বাইকের গতি বাড়িয়ে দেয়। বুড়ো বটের কাছে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।

মিলন চলে যাওয়ার পরও টুকি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। আজ আর কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। বারবার শুধু মনে হচ্ছে, ওই বুড়ো বটকে কি বাঁচানো যাবে না? শুধু এই আধপাগলা, আলাভোলা একটা আশ্চর্য মানুষের জন্য? কী জানি কেন, টুকির বুকের ভিতরটা তোলপাড় হতে শুরু করে।

* * *

উঠোনে, রোদে, চৌকির ওপর আদুর গায়ে শুয়েছিল কানু ঘোষ। বেলা এখন এগারোটা। এই রোদে শুয়ে থাকতে বেশ আরাম লাগছে। একটা ভাড়া করা লোক আছে। রোজ এই সময়টা এসে তেল মাখিয়ে কানুর সারা শরীর ম্যাসাজ করে দিয়ে যায়। এই ম্যাসাজ করানোটা কানুর একটা শখও বলা যায়। শীতকালে এই ম্যাসাজটা করাতে বেশ লাগে কানুর। আবেশে চোখ দুটো বুজে আসে। আজও বুজে আসছিল। তবে ঘুমিয়ে পড়লে তো কানুর চলবে না। সজাগ থাকতে হবে। কানুর অনেক শত্তুর। দলের বাইরে, দলের ভিতরেও। কাজেই যখন তখন ঘুমিয়ে পড়লে চলে না। এই যেমন এখন, ম্যাসাজ করতে করতে আবেশে চোখ বুজে এলেও, কানুর চোখ কান চারদিকেই সজাগ আছে। উঠোনের চার কোণায় চারজন ষণ্ডাগুণ্ডা জওয়ান গোছের লোক দাঁড়িয়ে। ওরা কানুর ভাড়া করা দেহরক্ষী। এরকম আটজন দেহরক্ষী সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে কানুকে। তাদের চোখ সদাসর্বদা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। জরিপ করে তারা চতুর্দিক। কানুকে সুরক্ষা বলয়ের ভিতর আগলে রাখে তারা।

শহর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কানু জানে এর সঙ্গে সঙ্গে টাকাও ছড়িয়ে পড়ছে। সে টাকা সময়মতো ধরতে জানতে হয়। সময়ে টাকা কী করে ধরতে জানতে হয়, তা কানু জানে। আর কানু এও জানে, টাকা থাকলেই ক্ষমতা, ক্ষমতা থাকলেই পিছনে মেলা লোকের সারি। কানুর টাকা আছে, ক্ষমতাও আছে। গত তিরিশ বছরে এই জেলার শেষ কথা কানুই বলেছে। অন্য কারো বলার সাহসই হয়নি। তিরিশ বছরে কতকিছু দেখল কানু। লাল পার্টি চলে গিয়ে এই পার্টি এলো। কানুও পার্টি অফিসের পতাকার রং পাল্টে ফেলল। কানুকে কেউ কিছু করতে পারল কি? পারল না তো। কানুর টাকাও আরও বাড়ল, ক্ষমতাও। এজন্য অনেকের চোখ টাটায়, তাও জানে কানু। তাতে কানুর অবশ্য কিছু যায় আসে না। ও নিজের কাজ নিজে করে যায়।

এই যেমন, শহর যে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে, এটা কানু সবার আগে বুঝেছিল। সোনাঝুরির জঙ্গল কেটে রিসর্ট হলো। আবাসন হলো। কিছুদিন দু-একটা খ্যাপাটে গোছের লোক একটু বাগড়া মারার চেষ্টা করেছিল। জঙ্গল কাটতে দেব না— বলে খুব চিল্লামিল্লি করেছিল। দু-একটা মিটিং আর সভাও করেছিল। তা কিছু করতে পারল? পুলিশ এসে ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। সেই তো রিসর্টও হলো, আবাসনও হলো। এখন কলকাতা থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে লোক এসে রিসর্টে থাকে। শনিবার সোনাঝুরির হাটে বাউল গান শুনতে ভিড় করে তারা। সাঁওতাল মেয়েদের নাচের ছবি তুলে নিয়ে যায়। এখন গোয়ালপাড়া থেকে প্রান্তিক অবধি রাস্তা চওড়া হবে। তাতে জমির দাম আরও বাড়বে। এই রাস্তা চওড়া করার ঠিকাদারি পেয়েছে কানুরই লোক। নিজের নামে সব কাজ অবশ্য করেও না কানু। প্রান্তিকের দিকে চারটে প্লট কেনা আছে কানুর। দুটো ছ'কাঠার, একটা দশ কাঠার আর একটা পনেরো। একটা ছেলের নামে, একটা মেয়ে-জামাইয়ের আর দুটো মেনকার নামে। মেয়েটা ভারি নরমসরম। যখন 'বাবা' বলে গা ঘেঁষে এসে বসে, তখন কানুর মন ভালো হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা বাপসোহাগি। যত আদর আবদার তার বাবার কাছে। এখন, এত বড় হয়েছে, ওর বিয়েও দিয়েছে কানু, তবু ওর আবদার সেই বাবার কাছেই। কানুর এখন বড় ইচ্ছে, মেয়ের ঘরে একটা নাতির মুখ দেখার। জামাইটাও কানুর খুব ন্যাওটা। তা হবে না-ই বা কেন, খেতে পেত না সেই ঘর থেকে তুলে এনে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। কেন দিয়েছে? সারা জীবন ওর মেয়ের পায়ের তলায় পড়ে থাকবে, এই জন্যই না। প্রান্তিকে মেয়ের নামে যে ছ'কাঠার প্লটটা কিনেছে, ওখানে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি বানিয়ে দেবে। সামনে বাগান।

ওখানে ওর ছোট্ট ফুটফুটে নাতি খেলা করে বেড়াবে— আবেশে চোখ বুজে আসতে আসতে ভাবে কানু।

তবে, ছেলেটার জন্য মাঝে মাঝে কানুর চিন্তা হয়। ছেলেটা বাপের মতো হলো না। সিংহের ঘরে যে ভেড়া জন্মায় এই প্রথম কানু দেখল। ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই তার থেকে একটু দূরে দূরে থাকে। মা ন্যাওটা। মেনকাই ওকে আগলে আগলে রাখে। ছোটবেলা থেকেই সামান্য জ্বরজারি হলেই কাবু হয়ে পড়ে ছেলেটা। নরম সরম গোছের আর কী! কারও সঙ্গে গলা উঁচু করে কথাটিও বলতে পারে না। তুই কানু ঘোষের ছেলে, কোথায় দাপিয়ে বেড়াবি— তা না। মেনিমুখো হয়ে ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছিস! তবে, ছেলেটার জন্য মাঝে মাঝে চিন্তা হয় কানুর। ও না থাকলে এ ছেলেকে যে সবাই পথে বসাবে। দেখেশুনে বেশ একটা জবরদস্ত মেয়ের হাতে এ ছেলেকে তুলে দিয়ে যেতে হবে। সে মেয়েই আগলে রাখবে এ ছেলেকে। সেরকম একটা মেয়ের খোঁজ করছে কানু। সেরকম মেয়ে পেলে ছেলের বিয়ে দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত। সে মেয়েকেই তার সাম্রাজ্যের ভার বুঝিয়ে দিয়ে যাবে কানু।

তবে, আর একটা চিন্তাও কানুকে ইদানীং বড় ভাবাচ্ছে। এবারের ইলেকশনে এম পি হতে চায় কানু। এখানে তো অনেক হলো। এবারে দিল্লিটা একবার দেখে আসা যাক। প্রথমবার যখন দিল্লি গিয়েছিল কানু, দলের নেতাদের সঙ্গে, অনেক বছর আগে, স্পষ্ট মনে আছে সেসব কথা। বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে থামওয়ালা বাড়িটা দেখেছিল। এখানেই নাকি সব মন্ত্রী, এম-পিরা আসে। কানু তখনই ভেবে রেখেছিল, একবার তাকেও আসতে হবে এখানে। লোকে বলবে, কানু ঘোষ এম-পি। তা রাজনীতির সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তো বোলপুরের কানু ঘোষ এম এল এ হয়েছে। এবার তাকে এম-পিটা হতেই হবে।

ম্যাসাজ করাতে করাতেই এসব ভাবতে থাকে কানু। আর পিটপিট করে আশপাশটা দেখতে থাকে। সজাগ থাকতে হবে। চোখ বন্ধ করলে চলবে না। চারদিকে শত্তুর। ঘরে-বাইরে। এই সময়েই ভেটকি এসে গুটিগুটি কানুর পায়ের কাছে দাঁড়ায়। সঙ্কোচে। কিছুক্ষণ তার আপাদমস্তক নিরিখ করে কানু। তারপর কিছুটা কর্কশ গলায় বলে ওঠে— তোকে কালকে সন্ধেবেলা একটা খবর নিয়ে আসতে বলেছিলাম না। নিয়েছিস?

— আজ্ঞে নিয়েছি।

— নিয়েছি তো এতক্ষণ জানাতে পারিসনি কেন? কাল সন্ধে থেকে আজ এই বেলা অবধি— এতক্ষণ লাগে তোর? এতক্ষণ কী করছিলি লাটের বাট?

— আজ্ঞে, কাল রাতে বউয়ের হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল। আজ সকালে ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটলাম। ওষুধপত্র কিনলাম। সাত ঝামেলায় একটু দেরি হয়ে গেল।

— অ্যাঁ, বউয়ের অসুখ হয়ে গেল— মুখ ভেংচে বলে কানু— মাথা ঢাকতে গিয়ে পাছার কাপড় উঠে যায়, তোরা শালা বিয়ে করিস কেন?

একথার কোনো উত্তর হয় না। তাই ভেটকি চুপ করেই থাকে। নীরবতা ভেঙেই কানুই আবার জিজ্ঞেস করল— তা, বউকে ডাক্তার দেখাতে আর ওষুধ কিনতে কত খরচা হলো তোর?

— আজ্ঞে, এই শ'পাঁচেক।

— আমার থেকে নিয়ে নিস।

খুশি হলো ভেটকি। আসলে পাঁচশো টাকা খরচাই হয়নি ভেটকির। কাল রাতে একটু বদহজম হচ্ছিল। আজ হজমের ওষুধ কিনে এনেছে দোকান থেকে। গোটা পঞ্চাশেক টাকা লেগেছে। এখন বাড়িয়েই বললো ভেটকি। ও মাঝে মাঝেই এরকম করে। কানুর অনেক আছে। কানুকে এটুকু ঠকালে কোনো ক্ষতি নেই— জানে ভেটকি।

— তা, কাল সন্ধ্যায় কী দেখে এলি?

— আজ্ঞে, ওই লোকগুলো তো বলছে গাছ কাটতে দেবে না।

— গাছ কাটতে দেবে না! ইল্লি আর কী? তা কী করবে ওরা?

— বলছে, গাছটাকে ঘিরে বসে থাকবে।

খ্যা, খ্যা করে হাসে কানু। বলে— ঘিরে বসে থাকবে। শুধু ঘিরে বসে থাকবে? তা একটু নাচগান হবে না?

— আজ্ঞে, তাও তো হয়েছে কাল। গান হয়েছে। আর মোমবাতি জ্বালিয়েছিল।

আবার খ্যা-খ্যা করে হাসে কানু। বলে— গান গেয়েছে, অ্যাঁ, গান গেয়েছে। তার ওপর আবার মোমবাতিও জ্বালিয়েছে!

তারপর আচমকা চেঁচিয়ে উঠে বলে— মেরে পিঠের চাম গুটিয়ে দেব। শালা, গাছ কাটতে দেবে না। নৌটঙ্কি হচ্ছে! কানু ঘোষের সঙ্গে নৌটঙ্কি। আমার লোকেরা যাবে, গাছ কাটবে, রাস্তা চওড়া করবে। দেখি কোন মায়ের ব্যাটা আটকায়। কানু ঘোষের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে আসছে। বুঝিয়ে দেব এবার।

এতক্ষণ চেঁচিয়ে এবার হাঁপাতে থাকে কানু। ভাবে, এত না চেঁচালেই ভালো হতো। ডাক্তার বলেছে, উত্তেজনা কম করতে। থামে। কিছুটা দম নেয়। তারপর বলে— তুই রোজ যাবি ওখানে। আজ কাল রোজ। চোখ রাখবি ওরা কী করে। আমি

দু-তিনদিনের ভিতর লোক পাঠাবো গাছ কাটতে।

ম্যাসাজ হয়ে গিয়েছিল। এবার ওঠে কানু। আদুর গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে নেয়। যেতে যেতে ভেটকির দিকে ফিরে বলে— আমার কাছ থেকে পাঁচশোটা টাকা নিয়ে যাস।

কানু স্নানে যায়। ভেটকি আনমনে এসে সামনের রাস্তায় দাঁড়ায়। একটা বিড়ি ধরায়। যাক, আজ ফোকটে পাঁচশোটা টাকা এসে গেল। ফেরার পথে একটু মুরগির মাংস কিনে নিয়ে যাবে। মেয়েটা খেতে ভালোবাসে। তবে, ভেটকি একবারও বলেনি, টুকির কাছে যে লোকটা যায়, গাছ ঘিরে বসে থাকার কথা ওই লোকটাই প্রথম বলেছিল। ইচ্ছে করেই বলেনি ভেটকি। আসলে ওই লোকটাকে ওর একটু একটু ভালো লাগতে শুরু করেছে।



।। সাত।।

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, সত্যধর্মা, আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন। হে পূষণ, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতি তনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ উপসংহার করুন, আপনার যাহা অতি সুশোভন রূপ, তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ আমি তাহা হইতে অভিন্ন।

পুবদিকের বারান্দায় বসে বারবার নিজের মনেই এই কথাগুলো আউড়ে যাচ্ছিল বুড়ো। রোজ সকালে প্রার্থনার সময় সে এটা বলে। আজ অনেকক্ষণ প্রার্থনা হয়ে গেছে। তারপর থেকেই বুড়ো বসে রয়েছে এই পুবদিকের বারান্দায়। অল্প অল্প করে কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেই রোদ ছড়িয়ে পড়ছে এই বারান্দায়। বারন্দার গা ঘেঁষে ওঠা শিরিষ গাছটার ডালপালা রোদে-আলোয় এখন মাখামাখি। পুবের বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে আপন মনেই বুড়ো ওই কথাগুলি বারবার আউড়ে যাচ্ছিল। কেন এরকম করছিল, তা বুড়ো নিজেও জানে না। কিন্তু প্রার্থনায় বলা ওই কথাগুলো, বারান্দায় বসে, সকালের এই নরম আলোয় বারবার বলতে বুড়োর ভালো লাগছিল। আজকাল এক জায়গায় বসলে খুব একটা উঠতে ইচ্ছে করে না, বাড়ি থেকেও খুব একটা বেরোতে ইচ্ছে করে না আজকাল। গাছপালা ঘেরা এই বাড়িটার একটি কোণে বসে থেকে বাইরের দিকে অপলক চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে শুধু। অথচ একসময় মাঠেঘাটে কত ঘুরে বেড়িয়েছে সে। এখন আর এসব কিছুই ইচ্ছে করে না। শরীরে শ্যাওলা জমেছে— বোঝে বুড়ো। সেদিন গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বটের তলায় কথাবার্তা সেরে ওঠার সময় দুবার বুকের বাঁদিকে ঝিলিক করে একটা ব্যথা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এ হচ্ছে, শরীরে শ্যাওলা পড়ার লক্ষণ— বুড়ো বোঝে। অনেক ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিল— 'দ্য সেলফিস জায়ান্ট'— স্বার্থপর দৈত্য। ওই দৈত্যও তারই মতো একটা বাগান ঘেরা বাড়িতে একা থাকত। একদিন সেই দৈত্যটা মরে গেল। সবাই এসে দেখল, বাগানে মরে পড়ে রয়েছে দৈত্য, আর তার শরীর ঢেকে রয়েছে গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুলে। আচ্ছা, তার শরীরও কি একদিন ঢেকে থাকবে ফুলে? বড়ো যত্ন করে যে গাছগুলোকে সে বড়ো করে তুলেছিল, তারা কি আদর করে যাবে তার শরীরে? আচ্ছা, সে-ও কি স্বার্থপর ছিল ওই দৈত্যের মতো? মনে হয় ছিল। ছিল বলেই হয়তো এই বাগানঘেরা বাড়িতে সে একা একা কাটিয়েছে। নিজের মতো করে, নিজের আনন্দে গড়ে তুলেছে এই বাগানকে। এই বাগান কাউকে স্পর্শ করতে দেয়নি। এ কি তার স্বার্থপরতা নয়?

এরকম সাত-পাঁচ ভাবনা আজকাল মনে আসতে থাকে। শরীরে শ্যাওলা জমলে এরকমই হয় বোধহয়। এই ক'দিন আগে যেমন ওই ফঙ্গবেনে লোকটার কথা খুব মনে পড়ছিল। অনেক বছর আগে গোয়ালপাড়ার রাস্তা ধরে কোপাইয়ের দিকে যাওয়ার সময় লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অদ্ভুত এক জীবনবোধের কথা বলেছিল সেই লোকটা। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, লোকটা পথ চলছিল আর গুনগুন করে গান গাইছিল। মন দিয়ে ও শুনেছিল লোকটার গান। গানের দুটো কলি এখনও মনে আছে— 'পরের জায়গা, পরের জমি, ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই'.... অদ্ভুত একটা সুর ছিল গানটায়। সেই সুর বুড়োর মাথায় এখনও গেঁথে আছে। এখনও মাঝে মাঝেই সুরটা গুনগুন করে ওঠে বুড়ো।

ওই ফঙ্গবেনে লোকটার সবকিছুই কেমন যেন অদ্ভুত ছিল। চালচলন থেকে কথাবার্তা— সব। এমন অদ্ভুত মানুষ বুড়ো এ জীবনে কমই দেখেছে। বলা ভালো দেখেইনি। আসলে, কত কিছুই তো দেখার বাকি রয়ে গেল। অনেক কিছু না দেখেই চলে যেতে হবে। তবু, বুড়োর এজন্য কষ্ট নেই। যা দেখা হলো, তাই ঢের। এই যে রোজ দু'চোখ ভরে তার চারদিকে ছড়িয়ে থাকা

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

With Best Compliments:-

Monoj Kumar Kakra

Krishna Bangles

37, Biplabi Rashbehari Bose Road

2nd floor, Kolkata-1

চরাচর দেখে, তাই বা ক'জন দেখতে পায়? দেখতে চায় ক'জন? সবাই নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে। আয়নায় নিজেকেই শুধু দেখে সবাই। অথচ একটু চোখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে যদি তাকাতো, কত আশ্চর্য দৃশ্যকল্প চোখে পড়ত তাদের। এই যেমন বর্ষার জল কীভাবে নারকেল গাছের পাতার ওপর ঝরে পড়ে, কীভাবেই বা সূর্যমুখী সকালের আলোয় জেগে ওঠে— এইসব আর কী খুব ছোটখাটো। তবু দেখার মতো তো।

এই সবই সাত-পাঁচ ভাবছিল বুড়ো। উঠে গিয়ে যে চা বানাবে সে ইচ্ছেও আজ করছিল না। এই সময়ই অরণ্য এসে ঢুকল। সোজা বুড়োর সামনে, বারান্দায়।

— নীচের দরজা খুলে রেখেছেন দেখলাম, তাই সোজা ওপরে চলে এলাম।

— হ্যাঁ, ও তো সকাল থেকে খুলেই রাখি। আমার বাড়িতে ডাকাত পড়বে না। তবে ফুল চুরি করতে চোর ঢুকলেও ঢুকতে পারে। বলে একটু মুচকি হাসে বুড়ো। তারপর বলে— তা, তুমিও কি ফুল চুরি করতে এলে নাকি?

— সে আপনি যা ভাবেন।

— যাক। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস। আমি এখনও চা খাইনি। এবার একটু চা বানাই। আলসেমি কাটিয়ে চেয়ার ছেড়ে ওঠে বুড়ো।

অরণ্য বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। গাছের ডালপালায় সকালের আলো মাখামাখি হয়ে অদ্ভুত সব বিমূর্ত ছবি তৈরি করেছে। দূরে কোথাও একটা মোরগ একটানা ডেকে যাচ্ছে। চার-পাঁচটা নাম না-জানা ছোট পাখি বারবার উড়ে এসে বারান্দায় বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে।

— তা মাস্টার, আজ যে সকাল সকাল? আজ ইস্কুল নেই? চা বানাতে বানাতেই জিজ্ঞেস করে বুড়ো।

— নাহ্, আজ মাঘোৎসব। ভাবলাম, একটা ছুটি নিয়ে নিই। এমনিতেই যেতে ভালো লাগছিল না।

— ইস্কুল কামাই করে সোজা আমার এখানে এসে হাজির।

— আপনার কাছে একটু আসব ভাবছিলাম। একটা কথা আপনাকে খুব জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল। সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আজ স্কুলে যাইনি, তাই চলে এলাম। আজকেই জিজ্ঞেস করব প্রশ্নটা।

— তা এসেছ বেশ করেছ। তুমি এলে ভালোই লাগে আমার। এখন চা খাও।

অরণ্যের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে বসে বুড়ো। দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব বসে থাকে। চা খায়। বাইরের গাছপালা দেখে। একসময় সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে অরণ্যই বলে— আপনাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল আমার। করি আজ?

— কর।

— আপনি কি ম্যাজিক জানেন? বা, সম্মোহন?

অরণ্যের আচমকা এ ধরনের প্রশ্নে কিছুটা অবাক হয় বুড়ো। তারপর বলে— হঠাৎ এই প্রশ্ন?

— না, এই আগে যেদিন এসেছিলাম, বিকেলের দিকে সেদিন আপনার বাড়ির জানালা থেকে আপনি একটা অদ্ভুত আলো দেখিয়েছিলেন। বাইরের গাছপালা সব সেই আলোয় মাখামাখি ছিল। ওরকম অদ্ভুত কমলা রঙের আলো আমি আগে কখনো দেখিনি।

— হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম তো। সে আলো তো আমিও দেখেছি। তাতে হলোটা কী?

— না, মানে, আপনার বাড়ির জানালা থেকে আলোটা দেখেছিলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে আর সেই আলোটা দেখতে পেলাম না। সত্যিই ওরকম আলো এসে পড়েছিল তো বাইরে! নাকি পুরোটাই আমার বিভ্রম? আপনি ম্যাজিক করেছিলেন? বা, সম্মোহন?

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে বুড়ো। বলে— ওহ্, এই তোমার প্রশ্ন। তোমাকে তো সেইদিনই বলেছিলাম, এ আলো সবসময় দেখা যায় না। সারা জীবনে একবার, কি দুবার এই আলো মানুষ দেখতে পায়। আর এই আলো যখন নেমে আসে পৃথিবীতে তখন মনের ভালো ইচ্ছা মুখ ফুটে বলে ফেলতে হয়। সেদিন তুমি যখন আমার ঘরে বসেছিলে, তখন এই আলোটা বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ তো এ আলো থাকে না। তুমি বাইরে বেরোতে বেরোতে এ আলো চলেও গিয়েছিল। বুড়োর উত্তর খুব একটা মনঃপূত হলো না অরণ্যর। ওর মনে হলো, বুড়ো কিছু আড়াল করতে চাইছে। কোনো রহস্য! এ বুড়ো নিশ্চয়ই কোনো ম্যাজিক জানে। তুকতাকও জানতে পারে। বুড়োকে বরাবরই অদ্ভুত লাগে অরণ্যর। কিন্তু এসব তো এখন বলা যাবে না। তাই কথা ঘোরানোর জন্য বলে— গোয়ালপাড়ার লোকগুলো কি বুড়ো বটকে বাঁচাতে পারবে? কী বলেন?

— জানি না। তবে এটুকু জানি, ওদের মনের জোর রয়েছে।

— মনের জোর দিয়ে কি সবকিছু হয়? কানু ঘোষের কত লোক লস্কর আছে। গুণ্ডা, মস্তান, পুলিশ। গাছ কাটতে এলে কী করবে? পারবে ওকে ঠেকাতে?

— যাদের মনের জোর আছে, তারা সবকিছুই করতে পারে জানো তো? গাছটাকে ঘিরে কেমন বসে আছে দেখ ওরা। কত

ভালোবাসা গাছটার জন্য। যেন ওদের সংসারের কেউ।

— হ্যাঁ, কাল রাতে দেখেছিলাম ওরা গাছটাকে ঘিরে প্রদীপ জ্বালিয়েছে। যেন দেওয়ালি। আজও আপনার বাড়ি আসার সময় দেখলাম ওরা গাছটাকে ঘিরে বসে আছে। দিনরাত পালা করে বসছে ওরা সবাই।

— বুঝলে তো, ওই জড়িয়ে থাকাটাই আসল কথা। তাতে একে অপরের হৃদয়ের শব্দটা বুঝতে পারে।

— ওই গাছে ওরা লাল সুতো বাঁধে, মানত করে। ওদের সব মানত ফলে নাকি? আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

— ফলে কি ফলে না জানি না। তবে এই বিশ্বাসটা আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে। বিশ্বাস না থাকলে কী নিয়ে বাঁচবে বলো মানুষ?

দু'জনের কেউই আর অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না। নীরবে অতিবাহিত হয় কিছুটা সময়। বাইরে এখন কুয়াশা কেটে গিয়েছে। রোদে একটু তেজও এসেছে। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাপটা মারছে। বেকারির কেকওয়ালা একটু আগে হেঁকে গেল রাস্তা দিয়ে।

অরণ্য উঠে দাঁড়াল। বলল— যাই। একটু বাজার ঘুরে বাড়ি যাব।

— আবার এসো। বিকেলের দিকে এসো। আবার যদি ওরকম আলো দেখতে পাও। একটু হেসে বলল বুড়ো।

অরণ্য চলে যাওয়ার পরও চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। প্রান্তিক স্টেশন দিয়ে দুটো ট্রেন গেল। তাদের চলে যাওয়ার ঝুমঝুম ঝিকঝিক আওয়াজ শুনলো। তারপর মনে পড়ল, গাছে জল দিতে হবে। অনেকক্ষণ ধরে উন্মুখ হয়ে রয়েছে গাছগুলো। উঠে দাঁড়াল বুড়ো। আর তখনই বুকের বাঁদিকটায় একটা হালকা চিনচিন করে উঠল কি?

* * *

মাঘোৎসবের প্রার্থনা বেশ কিছুক্ষণ হলো শেষ হয়ে গিয়েছে। যারা এসেছিল, তারা অনেকেই বাড়ি ফিরে গিয়েছে। ইতস্তত এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন। ছাতিমতলায় ছোট ছোট দু-একটা জটলা। ওখান থেকে হালকা হাসি মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। উপাসনা মন্দির মোমের আলোয় এখনও উজ্জ্বল। মন্দিরের ঝাড়লণ্ঠনগুলোও এখনও জ্বলছে। জ্বলবে আরও বেশ কিছুক্ষণ। আলোয় উদ্ভাসিত উপাসনা মন্দিরটি এইসময় দেখতে বেশ লাগে। একটু দূরে, আম্রকুঞ্জের অন্ধকারে, একা বসে এসব ভাবছিল সংঘমিত্রা। মাঘোৎসবের প্রার্থনার পর সংঘমিত্রা এখানে এসে বসেছিল। অত ভীড় ওর ভালো লাগছিল না। ভালো লাগছিল না আর কারও সঙ্গে কথা বলতে। বরং, এখানে, এখন একা বসে, ওই আলোক উজ্জ্বল উপাসনা মন্দির দেখতে ওর ভালো লাগছিল।

আজকাল অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা খেলে যায় সংঘমিত্রার মনে। অবাক করা সব প্রশ্নরা ভিড় করে আসে ওর মনে। সব প্রশ্নের উত্তর যে ও পায় এমন নয়। তবে, কোনোটা কোনোটা পেয়ে যায়। এই যেমন দুদিন ধরে ভেবে ভেবে একটা প্রশ্নের উত্তর ও কিছুতেই পাচ্ছে না। অথচ প্রশ্নটা খুব সহজ। সামান্য একটা প্রশ্ন। তবু উত্তরটা ও পাচ্ছে না। অনেক ভেবেছে দুদিন ধরে, উত্তরটা পায়নি। সেদিন গোয়ালপাড়ায় বুড়ো বটের তলায় সবাই যখন বসেছিল, ও তখন ফস করে বলে ফেলেছিল, মাঘোৎসবের আগে এই গাছ ঘিরে আমরাই উৎসব শুরু করে দিই না কেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে, গান গেয়ে এই গাছটাকে ঘিরে হোক আমাদের উৎসব। কেন সেদিন ওরকম কথাটা বলেছিল? ভেবে পায় না আর। কেউ তো ওকে বলতে বলেনি। নিজের থেকেই বলেছিল। কিছুটা না ভেবে চিন্তেই। পরে মনে হয়েছিল, ওর বুকের ভিতর থেকে কে যেন একজন এরকম একটা কথা বলতে বলেছিল। কিছুটা ঘোরের ভিতরেই যেন এরকম একটা কথা বলেছিল। তারপর আরও অবাক কাণ্ড! সেদিন একটা গানও গেয়ে ফেলেছিল ও। কিছু না ভেবেই। গানটা শেষ করে দেখেছিল নতুন পল্লির ওই বুড়োটা, যাকে কিনা গোয়ালপাড়ার লোকগুলি খুব মান্যি করে, কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে! বলেছিল— এ তুই কী গান শোনালি? মনে হলো, ঈশ্বর যেন নেমে এসেছিলেন তোর গান শুনতে। নতুন পল্লির এই বুড়ো লোকটাকে এমনিতেই ওর একটু অদ্ভুত লাগে। রহস্যময়। কখন কী বলে কিছুই বোঝা যায় না। তবু, ওর গান শুনে একথা বলল কেন? ও কি খুব ভালো গেয়েছিল সেদিন? ঈশ্বর নেমে আসার মতো ভালো? ও তো কোনোদিন কারও কাছে গানই শেখেনি। তাহলে এরকম গাইলো কী করে? আসলে, ওদিনের সব ঘটনাটাই ওর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে এখনও। কেন যে এরকম করল ও সেদিন, সেটাই বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আসলে ও গানটা শোনাতে চেয়েছিল। ওর বুকের ভিতর গানটা কোথাও গুনগুন করছিল। শোনাতে ইচ্ছে করছিল গানটা। সেদিন যখন সবাই ওই বটগাছটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছিল, একটি একটি করে মোমবাতি জ্বলে উঠছিল বটগাছটাকে ঘিরে, তখন বুকের ভিতর থেকে ওই গানটাই বেরিয়ে এসেছিল। অনেক ভেবে এই কারণটাই খুঁজে পেয়েছে সংঘমিত্রা, অন্য কোনো কারণ নয়।

কলেজে যখন পড়ত, তখন দেখেছে ওর অনেক বান্ধবী কারণে অকারণে হাসি হাসি মুখে গুনগুন করে গান গাইত। কেউ রবীন্দ্র সংগীত, কেউ বা হিন্দি সিনেমার গান। ও এও লক্ষ্য করেছে, প্রেমে পড়লে মেয়েদের এরকম গুনগুন করে গান গাওয়ার বাতিক পেয়ে বসে। ছেলেদেরও এরকম হয় কিনা কে জানে। তবে হয় মনে হয়। সিনেমায় এরকম দেখেছে। অনেক কিছুই যেমন জানে না, তেমনি প্রেম করলে যে বুকের ভিতরটা কেমন করে তাও জানা নেই সংঘমিত্রার। আসলে ও তো কোনোদিন প্রেম করতেই পারল না। এই মার্চে ওর তিরিশ পূর্ণ হবে। এতগুলো বছর চলে গেল, তবু সেভাবে ভালোবাসার কোনো মানুষ আবিষ্কার করা ওর পক্ষে সম্ভব হলো না। অথচ সংঘমিত্রার প্রেমে যে কেউ পড়েনি এমন নয়। অন্তত তিনজনের কথা ও জানে যারা ওর প্রেমে পড়েছিল। সংঘমিত্রাকে দেখতে খুব একটা খারাপ নয়। সহজ ভাষায় যাকে বলে সুশ্রী। ওর মা একবার ওকে না জানিয়েই কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তাতে লিখেওছিল 'একমাত্র কন্যা, সুশ্রী, পিতার দোতলা বাড়ি আছে।' বিজ্ঞাপনের ভাষাটি মোটেই পছন্দ হয়নি সংঘমিত্রার। ওর এখনও মনে আছে, যখন ক্লাস টেনে পড়ে, তখন পাড়ার একটা ছেলে ওর প্রেমে পড়েছিল। রোজ সকালে-বিকেলে ওদের বাড়ির সামনে সাইকেল নিয়ে চক্কর খেত। সংঘমিত্রা বারান্দায় এসে দাঁড়ালে, রাস্তার উল্টোদিকে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে আকাশ দেখত ছেলেটা। সংঘমিত্রা, বুঝতো, আসলে আকাশ নয়, ছেলেটা আড়চোখে ওকেই দেখছে। সংঘমিত্রা ভালো করে ছেলেটার মুখের দিকে কখনো তাকায়নি। বরং, রাস্তায় কখনো সামনাসামনি হয়ে গেলে গম্ভীর মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেছে। সাইকেল নিয়ে বেশ কয়েকমাস এভাবে ঘোরাঘুরির পর ছেলেটা আর কখনো আসেনি ওদের বাড়ির সামনে। পরে পৌষমেলায় ওই ছেলেটাকে দেখেছিল একটা মেয়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে। দেখে বেজায় হাসি পেয়েছিল সংঘমিত্রার।

দ্বিতীয় প্রেমটা এসেছিল ওর কলেজ জীবনে। ওর থেকে ঠিক এক ইয়ারের সিনিয়র ছিল বিক্রম। বেশ সুদর্শন। গালে চাপ দাড়ি। এক একদিন এক এক রঙের পাঞ্জাবি পরত। বেশ শৌখিন ছিল বিক্রম। বাইক চালিয়ে কলেজে আসত। বিক্রম নিজে থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ করেছিল। ভালো কথা বলতে পারত বিক্রম। বিক্রমের বাইকের পিছনে চেপে কখনো কখনো ও খোয়াইয়ে ঘুরতে গেছে। কখনো কোপাইয়ের ধারে। কখনো বা ভুবনডাঙার মাঠে মুখোমুখি বসে গল্প করেছে। সমগ্র বিশ্বে কোথায় কী ঘটছে, সেরকম অনেক খবর রাখত বিক্রম। ভালো কথাও বলত। মোটের ওপর বিক্রমকে খুব একটা খারাপ লাগত না সংঘমিত্রার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওর মনে বিক্রমের প্রতি কোনো প্রেম এসেছিল। বরং, বিক্রমের মনে যে ওর প্রতি প্রেম ছিল, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিল সংঘমিত্রা। সেটা যখনই বুঝতে পারছিল, তখনই ও বিক্রমের প্রতি ক্রমশ নিস্পৃহ হচ্ছিল। বিক্রম যেদিন কোপাইয়ের তীরে বসে ওর হাতটা ধরতে চেয়েছিল, সেদিন হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলেছিল— 'তুমি বসো। আমি উঠি। আমার একটু অন্য জায়গায় যাওয়ার আছে।' বলে আর দাঁড়ায়নি। হন্‌হন্‌ করে হেঁটে বড়ো রাস্তায়। বিক্রমের বাইকে চড়েও ফেরেনি সেদিন। বিক্রম অবাক হয়ে তাকিয়েছিল— স্পষ্ট মনে আছে ওর। তারপর থেকে বিক্রম আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি। বিক্রম এখন আমেরিকায়।

তবে ওর তৃতীয় প্রেমিকের কথা ভাবলে সংঘমিত্রার বেশ হাসিই পায়। ওদের কলেজের ইংরেজির লেকচারার। লোকটা ধুতি পরে আর একটু আনুনাসিক সুরে কথা বলে। এরকম ধুতি পরা ন্যাকা ন্যাকা লোকদের ওর মোটেই ভালো লাগে না। টিচার্স রুমে লোকটা সবসময় আড়চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকত। গায়ে পড়ে দু-চারবার কথা বলারও চেষ্টা করেছে। ব্যাপারটা বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছল সেদিন, যখন কলেজ থেকে ফেরার পথে ওর রাস্তা আটকে একটা ইংরেজি কবিতার বই আর গোলাপ ফুল উপহার দিতে চেয়েছিল। গলায় কাঠিন্য এনে সংঘমিত্রা বলেছিল— 'এসব একদম করবেন না। পরে আবার যদি এরকম করেন, তাহলে আমি প্রিন্সিপালের কাছে কমপ্লেন করব।' লোকটার মুখটা তখন দেখার মতো হয়েছিল। মনে করলে এখনও সংঘমিত্রার হাসি পায়। তবে, পরে অবশ্য মনে মনে একটু দুঃখিত হয়েছে। অতটা কড়া করে না বললেই হতো মনে হয়েছে। অবশ্য এরপর থেকে লোকটা আর আড়চোখে ওর দিকে তাকাতো না। উল্টে এর কয়েকমাস পরে টিচার্স রুমে ওর দিকে একটা বিয়ের কার্ড এগিয়ে দিয়ে মিনমিন করে বলেছিল— 'আমার বিয়ে। হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেল কিনা।'

ওর মা যে কতবার ওর জন্য পত্র ঠিক করেছে, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। কেউ বিলেতে থাকে, কেউ দিল্লিতে, কেউ কলকাতায়। জীবনে এরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। তা পাত্রী হিসেবে সংঘমিত্রাও তো ফেলনা নয়। এক সন্তান, শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাড়ি, একটা কলেজের লেকচারার— কম কিসে! ফলে পাত্রপক্ষের সহজেই পছন্দ হয়ে যেত ওকে। কিন্তু ও কাউকেই পছন্দ করত না। ফিরিয়ে দিত সবাইকে। মনে হতো কাঙ্ক্ষিত পুরুষটি এখনও

এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পুরুষটি যে কেমন, কোন রাজবেশ পরে যে সে এসে দাঁড়াবে— এতদিন পর্যন্ত মোটেই ভেবে পায়নি সংঘমিত্রা। খুব রেগে যেত মা। বলত— এরপর কি তোর জন্য পাত্র গড়িয়ে আনবো? ও রাগত না, বরং বলত— বিয়ে না করে সারাটা জীবন কি থাকা যায় না মা? অনেকে তো তাই থাকে। এসব কথায় মায়ের রাগ আরও বেড়ে যেত। এখন অবশ্য এসব নিয়ে মা আর কিছু বলে না।

উপাসনা মন্দিরের মোমবাতিগুলো একে একে নিভতে শুরু করেছে। ছাতিমতলার জটলাটাও এখন আর নেই। দু-একজন এদিক-ওদিক যাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তারাও ফিরতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডাটাও বেশ বেড়েছে এবার। সংঘমিত্রা ওঠে। ওকেও বাড়ি ফিরতে হবে।

ছাতিমতলা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। রাস্তাটাও এখন ফাঁকা। দু-একটা রিক্সাওয়ালা সওয়ারির আশায়। ও অবশ্য রিক্সায় উঠবে না। হেঁটেই যাবে। ভাবতে ভাবতেই পা বাড়ায়। কিছুটা এগোতেই লক্ষ্য করে ভুবনডাঙার দিক থেকে হেঁটে আসছে অরণ্য। মুখ নীচু করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। একটু অন্যমনে। যেন কী ভাবতে ভাবতে আসছে। কাল গান গাইতে গাইতেই সংঘমিত্রা লক্ষ্য করেছিল, সবার পিছনে অরণ্য বসে আছে। কী আড়ষ্ট ভঙ্গি। কী জড়তা। এত লজ্জা কিসের ওর কে জানে।

সংঘমিত্রা দাঁড়ায়। মাথার চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করে নেয়। গায়ের চাদরটা, অকারণেই, একটু টেনে নেয়। অরণ্যর সঙ্গে কথা বলতে মন চায় সংঘমিত্রার।



।। আট।।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ চেপে শুয়েছিল কানু ঘোষ। আজ সকাল থেকে বড্ডো ধকল গেছে। যেখানে যত ঝঞ্ঝাট সব এই একার হাতে কানুকে সামলাতে হয়। মাঝেমধ্যে মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়। তখন মুখ ফসকে দু-একটা অকথা-কুকথা বেরিয়ে যায়। ডাক্তার অনেকবার বলেছে, মেজাজ গরম করবেন না। তাহলে প্রেসার বাড়বে। আর প্রেসার বাড়লে শরীর বিগড়োবে। এখন শরীরটা বিগড়ে যাক, তা চায় না কানু। শরীর বিগড়োলে আর এম-পি হওয়া যাবে না। তখন পার্টির ভিতরেও অনেকে খুশি হবে। সামনে যারা কানুবাবু কানুবাবু করে আড়ালে তারাই তখন ভেংচি কাটবে— জানে কানু। সবকটাকে চেনে কানু, সবকটা হারামি। তাই কানু চেষ্টা করে যায় শরীর ঠিক রাখার। মেনকাও চেষ্টা করে কানু যাতে ঠিক থাকে। সে দিকে মেনকার কড়া নজর। কানুর মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রান্না মশলা ছাড়া। কানুও সেসব নিয়ম মেনে চলে। শুধু টুকির ঘরে যেদিন আসে সেদিন একটু-আধটু নিয়ম ভেঙে যায়। টুকির রান্নাটা বেশ ভালো আর শরীরেও চটক আছে। তবু কানু কখনো কখনো মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। আর কাগজওয়ালারা বসে থাকে কখন কানুর মেজাজ বিগড়োবে। বেগড়ানো মেজাজ নিয়ে কানু মুখ খুললেই খবর। তখন কানু কী বলল, তা নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় চারদিকে। ক'দিন বেশ হৈ-চৈ চলে, তারপর আবার সব চুপ মেরে যায়। বেশ মজা লাগে কানুর। আজকে যেমন মেজাজটা বিগড়ে গেছে সকাল থেকে। মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে সাঁইথিয়ার নতুন ও-সি। কম বয়স। রক্তে জোশ আছে, বোঝে কানু। কাজ দেখাতে চায়। তা বলে কানু ঘোষের সঙ্গে পাঙ্গা নিবি? জানিস না কানু ঘোষের হাত কত লম্বা। পরশু কানুর দলের দুটো ছেলেকে সোজা ধরে লকআপে চালান করে দিয়েছিল। অভিযোগ, ওরা নাকি কাকে ভয় দেখিয়ে টাকা তুলছিল। তা তুলছিল, তুলছিল। তুই ওসি আছিস কী করতে? বুঝিয়ে সুজিয়ে ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতি। তা না করে সোজা লকআপ! তাতেও হলো না। কাল কোর্টে চালান করে পনেরো দিনের জেল! পার্টির ছেলেরা কানুর নাম করে গিয়েছিল ওসি-র কছে দরবার করতে। ওদের মুখের ওপর এই নতুন ওসি-টা বলে দিয়েছে— ওসব কানু ঘোষফোস আমাকে দেখাবেন না। শুনেই কানু ঘোষের মেজাজ চড়াক করে গরম হয়ে গিয়েছিল। কানু ঘোষফোস দেখাবে না— এ বলে কী? পাঙ্গা লড়তে এসেছে কানু ঘোষের সঙ্গে? এখনই ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতে না পারলে— লোকে ভাববে কানু ঘোষ ভয় পেয়েছে। কাজেই আজ সকালেই দলবল নিয়ে কানু নিজেই ছুটে গিয়েছিল সাঁইথিয়া।

প্রথমে থানায় টেবিল চাপড়ে খানিক খুব জোর চেঁচামেচি হয়েছিল। নতুন ওসি-টা বেশ টেটিয়া। পাত্তাই দিতে চায়নি কানুকে। বলে কিনা, আইন আইনের পথে হাঁটবে। আপনার যা করার করে নিন। অ্যাঁ, বলে কী? আইন আইনের পথে হাঁটবে? ধুস, এ জেলায় সে কোনোদিন হয়েছে নাকি। এখানে আইন কানুর পথে হাঁটবে। এ জব্বর ডায়লগটা ও ঝেড়েও দিয়েছিল ওসি-র সামনে। আর তারপরই বুঝেছিল কাল কাগজে কানুর এ

কথাটাই হেডলাইন হবে। তা নিয়ে আবার হৈচৈও হবে। শেষে, চিফ মিনিস্টার ফোন করে একটু মিষ্টি গলায় শাসন করবেন। চিফ মিনিস্টার ওকে কখনো কড়া গলায় কিছু বলেন না, জানে কানু। আর বলবেনই বা কেন? শান্তিনিকেতনে দশ বিঘে জমির ওপর বাগানবাড়িটা চিফ মিনিস্টারের ছোট ভাইকে দখল করিয়ে দিল কে?

থাক গে সেসব কথা। কানুর অবশ্য অন্য একটা কথা ভেবে খুব চিন্তা হয়েছিল। আগের পার্টির কথাই ধরুন, বা এখনকার পার্টি, কানুর মুখের ওপর এরকম করে কোনো দু-পয়সার ওসি কোনোদিন কথা বলার সাহস দেখায়নি। এই দু'দিনের পুচকে ওসি-টা কী করে সেই সাহস দেখালো? তাহলে কি কানুর রাশ আলগা হয়ে যাচ্ছে? লোকে কি আর ভয় পাচ্ছে না কানুকে? লোকে যদি আর কানুকে ভয় না পায় তাহলে ওর চারপাশের ভিড়টাও যে হালকা হয়ে যাবে। এমন চিন্তা মাথায় খেলে যেতেই কানু সতর্ক হয়। ঠিক করে নেয়, প্রথম রাতে বিড়াল মারার মতো ওসি-টাকে আজকেই শিক্ষা দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে কানু ঘোষের হাত কতখানি লম্বা। আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি কানু। থানায়, ওসি-র মুখোমুখি চেয়ারে বসেই সোজা ফোন করেছিল এস পি-কে। কানু ফোন করলে এস পি-র গলা যে একটু কেঁপে যায়, তা আগে লক্ষ্য করেছে কানু। এস পি কানুকে ভয় পায়, খাতিরও করে। গত মাসে চিফ মিনিস্টার যখন সিউড়িতে এসেছিলেন, তখন কানুকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে হাত ধরে এস পি বলেছিলেন— 'কানুবাবু, আমার হয়ে প্লিজ একটু সি-এমকে বলবেন। বলবেন, আমার কাজে আপনারা খুশি।' তা বলেছিল কানু। এস পি লোকটা কথা শোনে। ওকে নিয়ে কানুর কোনো সমস্যা নেই। আজকেও কানুর ফোন পেয়ে এস পি-র গলা একটু কেঁপেই গিয়েছিল। ওসি-র সামনে বসেই কানু গম্ভীর গলায় এস পি-কে বলেছিল— ওসি-কে এটু বুঝেশুনে কাজ করতে বলুন। এরপর ঝামেলা হলে আমার কোনো দায় থাকবে না। ব্যাস, এইটুকুই। আর কিছু বলেনি। তাতেই যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল এস পি। কানু ফোন রাখার দু-মিনিটের ভিতর এস পি-র ফোন ওসি-কে। একটু আমতা আমতা করছিল বটে ওসি প্রথমে। তবে, একটু পরেই ভিজে ন্যাতা। বিজয়ীর হাসি নিয়ে কানু বেরিয়েছিল থানা থেকে। কানু ঘোষের হাত যে কতখানি লম্বা— সে সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে। চারপাশের ভিড়টা আর কমবে না।

কোমরের কাছটা একটু টনটন করছে। তা করবে নাই বা কেন? কোমরের আর কী দোষ? এত দৌড়ঝাঁপ করলে কোমর তো একটু ব্যথা করবেই। কানুরও তো বয়স হচ্ছে, নাকি? আজকাল এইসব দিনগুলোতে শরীর একটু শুশ্রূষা চায়। শরীরের, মনেরও। আজ সাঁইথিয়া থেকে ফেরার পথে তাই টুকির এখানে চলে এসেছিল। কিছু না জানিয়েই।

— এইখানটায়, এইখানটায়, এই কোমরের দিকটায় একটু মালিশ কর। আস্তে আস্তে। বুকে বালিশ চাপা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থেকেই বললো কানু। টুকি এতক্ষণ পিঠে মালিশ করছিল, এবার তার হাত কোমরে নামল। আজ হঠাৎ করেই কানু এসে পড়েছে। এরকমভাবে কখনো আসে না। কানু এলে খবর দিয়েই আসে। বাঘের আগে যেমন ফেউ, তেমনই কানুর আগে আসে ভেটকি। ভেটকি এসে দুপুরে খবর দিয়ে যায়। অবশ্য মাগনায় খবর দেয় না ভেটকি। তার বদলে দশ-বিশটা টাকাও নিয়ে যায় টুকির কাছ থেকে। যেদিন কানুর আসার খবর থাকে, সেদিন বিকেল বিকেল হোটেল বন্ধ করে দেয় টুকি। স্নান করে সেজেগুজে, গায়ে একটু সেন্ট ছড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সেন্টটা কানুই এনে দিয়েছিল তাকে। তা কানু তাকে কিছু কম দেয় না। কয়েকটা গয়নাও তো গড়িয়ে দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই ভাতের হোটেলটা চলছে কানুর জন্যই। এ হোটেলে পুলিশ কখনো তোলা চাইতে আসে না। পুলিশ জানে, এ হোটেলটা কানু ঘোষের বাঁধা মেয়েছেলের। কানু বরাবর সন্ধে পড়লে আসে। আজ একেবারে ভরদুপুরে এসে হাজির। টুকি তখন হোটেলে খদ্দের সামলাচ্ছিল। হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে কানুকে নামতে দেখে অবাক টুকি। রান্নার লোকটার হাতে হোটেল সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে টুকি ঘরে চলে এসেছিল। পিছনে পিছনে কানু। টুকি জানে, যতক্ষণ কানু এই ঘরে থাকবে, ঘরের বাইরে পাথরের মতো চেহারা নিয়ে আটটা মুশকো জোয়ান দাঁড়িয়ে থাকবে। রাস্তায় পুলিশের জিপ থাকবে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে টুকি বলেছিল— কী গো, এমন অসময়ে?

— কেন, এই সময়ে আসতে পারি না?

— আহা, তা বললাম নাকি? এই সময়ে তো আসো না কখনো, তাই...

— আজ ইচ্ছা হলো, তাই এলাম। নে, এক গ্লাস জল খাওয়া আগে।

এক নিঃশ্বাসে চোঁ-চোঁ করে গ্লাসের সবটুকু জল শেষ করে কানু বলেছিল— বড়ো ঝামেলা গেছে আজ। যা তুই পরিষ্কার হয়ে আয়।

— হ্যাঁ। যাই স্নানটা করে আসি। তুমি বসো একটু।

স্নান করে উঠে টুকি একটা নীল শিফনের শাড়ি পরেছে। শাড়িটা কানুই দিয়েছিল। মুখে হালকা করে একটু পাউডার। গায়ে সেন্ট। মাথার চুলটা আলগোছে বাঁধা। চেষ্টা করেছে চেহারায় যতটা মাদকতা আনা যায়।

কোমর টিপতে টিপতে টুকি বলল— কী গো, কী ঝামেলা গেছে তা বললে না তো?

— ঝামেলা কি একটা নাকি? সারাদিনই ঝামেলা যায়। কত বলব তোকে?

— তা একটু বললেই পারো।

— ও শুনে তুই কী করবি? ওসব তুই বুঝবি না। পলিটিক্সের ঝামেলা।

— আজকে কার সাথে ঝামেলা হলো?

— ওই যে সাঁইথিয়ার ওসি-টা। ফটাক ফটাক করে কথা বলছিল। বলে, আইন আইনের পথে চলবে, অ্যাঁ!

বলে একচোট হেসে নেয় কানু। সঙ্গে টুকিও হাসে।

— ব্যাটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি কানু ঘোষ কে। আর কোনোদিন আমার সঙ্গে পাঙ্গা নেবে না।

— ঠিক করেছ। পুরুষ মানুষের একটু রাগঝাল থাকা ভালো। ম্যাদামারা মেনীমুখো পুরুষ আমার ভালো লাগে না।

কানু এবার চিৎ হয়ে শোয়। টুকি ওর বুকে হাত বোলাতে থাকে।

— সেই কখন বেরিয়েছ। একটু কিছু এনে দিই, খাও। আজ কাতলা মাছের ঝোল করেছি হোটেলে। আলু আর পেঁপে দিয়ে। এনে দিই?

— একটু পরে এনে দিস। এখন তুই একটু বস এখানে। একটু গল্প করি।

— ও মা, তোমার আবার সোহাগ চাপলো এখন? কপট বিস্ময়ের ভান করে টুকি।

— কেন, আমি কি তোকে সোহাগ করি না?

— কর তো, সে তো সন্ধেবেলা কর। দুপুরে তো কোনোদিন করোনি।

বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে টুকি। কানুর বুকের ওপরেই। কানুও রসিকতায় যোগ দেয়। বলে— আজ না হয়, দুপুরেই সোহাগ করব।

তারপর অকস্মাৎই গম্ভীর হয়। বলে— তোর ভাতের হোটেলটা এবার একটু বড় করে দিতে হবে। একপাশে ভাতের হোটেল, একপাশে রোল, চাওমিন। আরও চারটে লোক রাখবি, খরচা আমার।

— সত্যি গো? কতদিনের ইচ্ছে আমার হোটেলটা বড় করি। কানুর বুকে মুখ গুঁজে বলে টুকি।

— করবি, করবি। এম-পি ইলেকশনে টিকিট পেয়ে গেলেই তোর হোটেলটা এবার বড় করে দেব।

— কোন ইলেকশান গো? দিল্লির ভোট?

— হ্যাঁ। দিল্লির ভোট। এবার আমাকে টিকিট দেবে দল। আর দিলেই জিতব।

— জানো তো, আমিও না তোমার নামে একটা মানত করেছি।

— মানত? কী মানত?

— মানত করেছি, তুমি সবক'টা ভোটে জেতো। আর জিতে জিতে অনেক বড় হও।

— বেশ, তা কোথায় করলি মানতটা?

— ওই যে গো, গোয়ালপাড়ার দিকে যে বুড়ো বটগাছটা আছে, ওখানে।

এবার সরু চোখ করে তাকায় কানু। বলে— সব জায়গা থাকতে ওখানে মানত করলি কেন?

— ওটা খুব জাগ্রত জায়গা গো। ওখানে ইচ্ছেঠাকরুন থাকে। যে যা মানত করে তাই ফলে যায়। আমি ওই গাছের ডালে লাল সুতো বেঁধে মানত করে এসেছি।

— ছেনালি করছিস না তো?

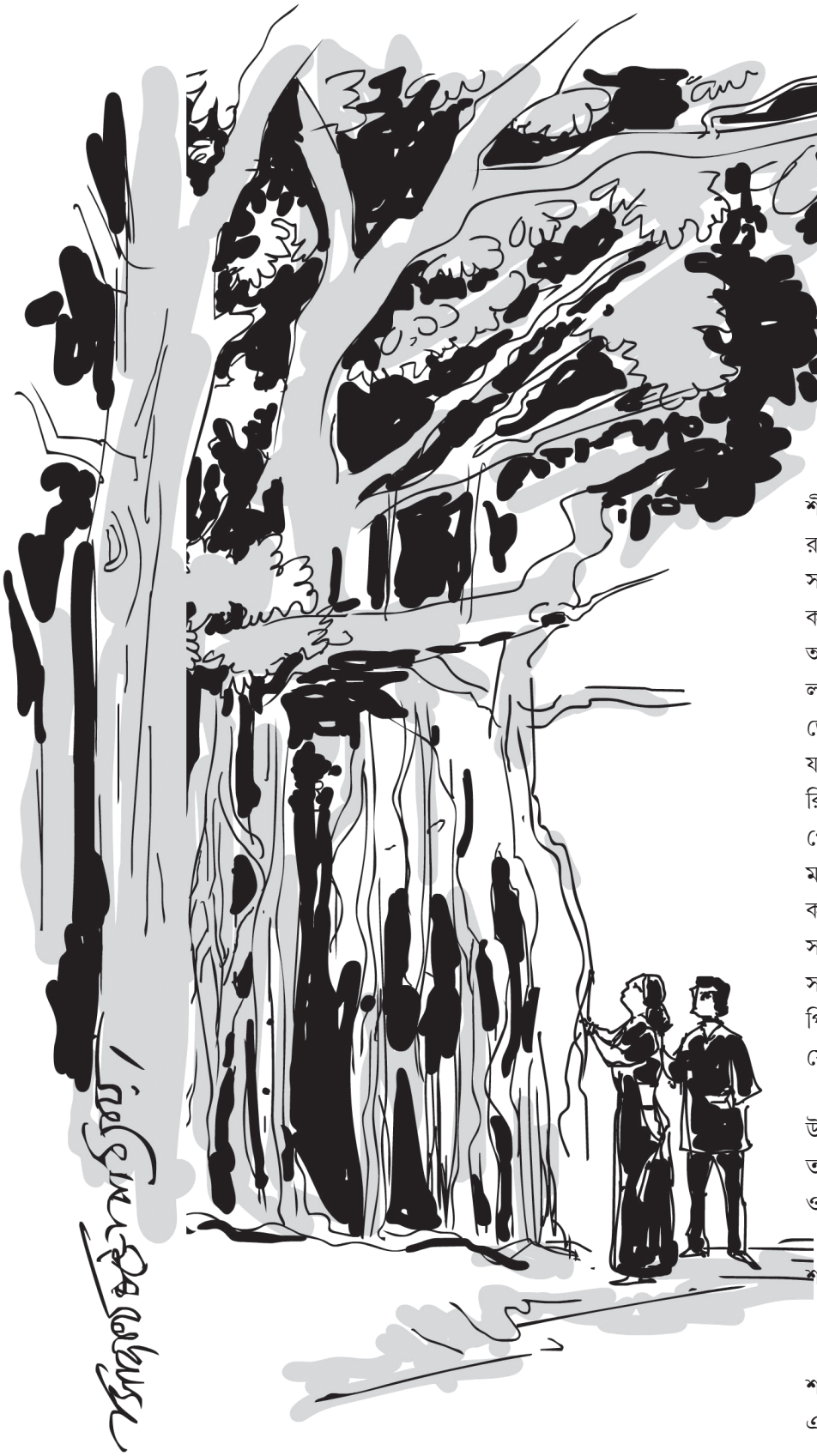
— মাক্কালি। কোনো ছেনালি করছি না। এই তোমাকে ছুঁয়ে একদম সত্যি বলছি। তুমি যত বড় হবে, তত আমারও লাভ কিনা বলো? আমার হোটেলটাও তো বড় হবে। কানুর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে টুকি।

কানু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

টুকি মনে মনে ভাবে, ওই ন্যালাখ্যাপা, ভুলোভালা, হিসেব না বোঝা লোকটার জন্য এইটুকু মিথ্যে কথা তো বলাই যায়। এতে ঠাকুর রাগ করবেন না।

* * *

মাঘোৎসবের দিন সন্ধেবেলা একটা অবাক করা কাণ্ড ঘটে গেল। এরকম যে ঘটতে পারে তা অরণ্য কখনো ভাবেনি। মাঘোৎসবের প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর ও একটু ভুবনডাঙার দিকে গিয়েছিল। ভুবনডাঙায় কাজ শেষ করে যখন ফিরছে, তখন দূর থেকেই দেখেছিল, তালধ্বজের সামনে একটু আলোয়, একটু অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, কারও জন্য যেন অপেক্ষা করছে। একটু কাছে আসতে দেখে সংঘমিত্রা। উপাসনা তো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরেও ফিরে গিয়েছে এতক্ষণে। জানুয়ারির এই শেষ দিকে



শীতের রাতে শান্তিনিকেতনের রাস্তাঘাটও বেশ ফাঁকা। এখানে, এই সময়ে সংঘমিত্রা কার জন্য অপেক্ষা করছে? ভেবে একটু অবাকই হয়েছিল অরণ্য। সেই সঙ্গে কেমন একটু আড়ষ্ট লাগছিল। একবার ভেবেছিল একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এই জায়গাটুকু পেরিয়ে চলে যাবে। কিন্তু রিক্সাগুলোও তো দূরে দূরে। রিক্সা ধরতে গেলেও তো ওই জায়গাটুকু পেরিয়ে যেতে হবে। সাতপাঁচ ভেবে মাথা নিচু করে হনহন করে হাঁটা শুরু করেছিল অরণ্য। সতর্ক ছিল, যাতে সংঘমিত্রার দিকে চোখ না পড়ে। কিন্তু সংঘমিত্রাকে পেরিয়ে যেতে না যেতেই পিছন থেকে কে যেন ডেকেছিল— এই যে শুনছেন...

একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অরণ্য। উপায় না থাকলেও চোখ তুলে পিছনে তাকিয়ে দেখেছিল সংঘমিত্রাই ডাকছে। ওর মুখে যেন একটু চাপা হাসি।

— হনহন করে চললেন কোথায়? শ্যামবাটির দিকে যাবেন তো?

— হ্যাঁ, ওই গোয়ালপাড়ায়।

— আমিও তো ওইদিকেই যাব। শ্যামবাটি। চলুন না একসঙ্গে যাই। একা একা হাঁটতে ভালো লাগছে না।

আড়ষ্টতা অরণ্যকে আরও জড়িয়ে

ধরছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। চোখ তুলেও তাকাতে পারছিল না। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে শুধু বলেছিল— চলুন...

পাশাপাশি দু-চার পা হাঁটার পর সংঘমিত্রা বলেছিল— আপনি গোয়ালপাড়ায় থাকেন বুঝি?

— না, রতন পল্লিতে।

— তাহলে এখন ওদিকে চললেন যে?

— আসলে ওই বটগাছটাকে ঘিরে সবাই গোল হয়ে বসে আছে তো। মোমবাতি জ্বালিয়েছে।

— ও হ্যাঁ। তাই তো।

তারপর আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। নীরবতা ভেঙে আবার সংঘমিত্রাই জিজ্ঞাসা করেছিল— আপনি বুঝি স্কুলে চাকরি করেন?

— হ্যাঁ।

— কোন স্কুলে?

— ওই তালতোড়ের দিকে হাইস্কুল। টিচার কম, ছাত্র বেশি।

— বাহ্, বেশ বললেন তো। টিচার কম, ছাত্র বেশি। বলে হেসে ওঠে সংঘমিত্রা।

— হ্যাঁ, গ্রামের দিকে স্কুলগুলো তো এরকমই।

— আমাদেরও তাই। ছাত্রী বেশি, টিচার কম।

— আপনিও স্কুলে?

— না, না কলেজ। বোলপুরে। এই তিনবছর হলো চাকরি পেয়েছি।

— আমার পাঁচ বছর হয়ে গেল।

— আপনার কোন সাবজেক্ট?

— সায়েন্স। কেমিস্ট্রি পড়াই।

— ও বাব্বা। আমি বিজ্ঞান কিছুই বুঝি না। আমি তো বাংলা পড়াই। বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতে খুব ভালো লাগে।

— আমি তো বৈষ্ণব পদাবলী পড়িইনি।

— পড়বেন। ভালো লাগবে।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। এবং আবার, যেন নিয়ম মেনেই নীরবতা ভাঙল সংঘমিত্রা।

— আপনার রতন পল্লির বাড়িতে কে কে আছে?

— কেউ না। আমি এখানে একা থাকি। বাবা-মা গ্রামে থাকে। আমি ভাড়া থাকি এখানে।

— আমাদের বাড়িতে আমি আর বাবা-মা। ব্যস, আর কেউ না। বলে একটু হাসে সংঘমিত্রা। তারপর কৌতুকমাখা চোখে প্রশ্ন করে— আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

— করুন।

— আপনি খুব লাজুক, তাই না?

— ধুস্।

— আমি বুঝতে পারি। আমার দোকানে আসেন। একা একা বসে চা খান। তারপর চলে যান। বলেই হেসে ওঠে সংঘমিত্রা।

মাথা নীচু করে শোনে অরণ্য। তারপর যেন স্বগতোক্তি করছে, সেভাবেই বলে ওঠে— আপনি সেদিন ভারী সুন্দর গান গেয়েছিলেন।

— কবে?

— ওই যে সেদিন। গোয়ালপাড়ায়। বুড়ো বটগাছের তলায় বসে।

— আপনি শুনেছেন? ভালো লেগেছে আপনার?

— হ্যাঁ। খুব। সত্যি বলছি।

এরপর অনেকক্ষণের নীরবতা। পাশাপাশি হেঁটে দুজনে শ্যামবাটি পৌঁছে যায়। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে বেখেয়ালে, আলগোছে সংঘমিত্রার শাড়ির আঁচল যে অরণ্যের শরীর স্পর্শ করে যায়নি, এমনও নয়। শ্যামবাটি বাজারের কাছে এসে অরণ্য থামে। বলে— এবার আমি তো সোজা যাব। গোয়ালপাড়ায়।

— আমিও সোজা যাব।

অরণ্য অবাক হয়। বলে— বললেন যে, আপনার বাড়ি শ্যামবাটিতে!

— হ্যাঁ। বাড়ি তো শ্যামবাটিতেই। কিন্তু আমি এখন সোজা যাব। গোয়ালপাড়ায়। আপনার সঙ্গে।

কোথায়, কখন, কী অবাক কাণ্ড ঘটে যায়— মানুষ তো বুঝতে পারে না।



।। নয়।।

একটা বড়ো কিছু ঘটে যাবে এবার। ভয়ংকর রকম কিছু। তোলপাড় হয়ে যাবে হয়তো সব। ক'দিন থেকেই এরকম মনে হচ্ছিল মিলনের। কিন্তু কী যে ঘটবে, সেটাই ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না। কাউকে সেভাবে বলতেও পারছিল না কিছু। নিজের মনেই বারবার আউড়ে যাচ্ছিল— 'ঘটবে, ঘটবে, এবার কিছু একটা ঘটে যাবে।' যেদিন বুড়ো বটগাছ কাটা পড়ার খবর শুনেছে, সেদিন থেকেই এরকম মনে হচ্ছে মিলনের। মুখ ফুটে

তা কাউকে বলতেও পারছে না। সেদিন খেতে বসে পারুলকে মুখ ফস্কে একবার বলে ফেলেছিল। পারুল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। জিজ্ঞেস করেছিল— কী ঘটবে? কোনো উত্তর দিতে পারেনি মিলন। কী যা তা বলো— বলে চুপ করে গিয়েছিল পারুল। পারুলকে আজকাল ঠিকমতো বুঝতে পারে না মিলন। অবশ্য কোনোদিনই কি পারলো বুঝতে? খুব দরকার না পড়লে পারুল আজকাল কথা বলে না। সারাদিন গ্রিলের কারখানা নিয়ে পড়ে থাকে। তবে, তা বলে মিলনকে যে যত্ন-আত্তি করে না এমনও নয়। রোজ দুবেলা নিজের হাতে ভাত বেড়ে দেয় মিলনকে। মিলনের পছন্দের রান্নাও করে। মিলনের পকেটে টাকা না থাকলে টাকাও ঢুকিয়ে দেয়। কর্তব্যে যেন কোনো ঘাটতি রাখতে চায় না পারুল। এ সংসারের সবাই পারুলকে মান্যি করে। মিলনকে খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না কেউই। এমনকী গ্রিলের কারখানার মিস্ত্রিরাও নয়। অবশ্য তা নিয়ে মিলনের কোনো দুঃখ বা অভিমান নেই। বরং একটা চাপা সুখই আছে। পারুল তো সব দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছে— এতেই খুশি মিলন। আরও একটা বিষয় মিলনকে খুব ভাবায় মাঝে মাঝে। পারুলের কি তার কাছে কোনো চাহিদা নেই— এরকম প্রশ্ন জাগে মনে। আজ অবধি পারুলের জন্য মিলন হাতে করে কোনোদিন কিছু নিয়ে যায়নি। অথচ, বিয়ের প্রথম প্রথম মিলনকে সবাই বলত— বাড়ি ফেরার পথে বউয়ের জন্য হাতে করে এটা সেটা নিয়ে যাবি। বউ খুশি হবে। কিন্তু মিলন রোজই ভুলে যেত। পারুলের জন্য হাতে করে কিছু আনাই হতো না। আর এরকম করেই দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল। বিয়ের দশ বছর পরেও কি বউয়ের জন্য কেউ হাতে করে কিছু নিয়ে যায়— জানে না মিলন। অথচ পারুল কিন্তু ওর জন্য বছরে দু-বার জামাকাপড় কেনে। নববর্ষ আর পুজোর সময়। ওর জন্মদিনে মনে করে কঙ্কালীতলায় পুজো দিয়ে আসে, পায়েস রান্না করে। একটা নতুন বাইক কেনার জন্য পারুল ওকে টাকা দিতেও চেয়েছিল। কিন্তু মিলন নেয়নি। এই বাইকটাকে ও দূরে সরিয়ে দিতে চায় না। দিলে বাইকটা দুঃখ পাবে— ও জানে।

কিছু একটা ভয়ংকর রকম কাণ্ড ঘটে যাবে— এরকম যে ওর মনে হচ্ছে, এটা টুকিকেও বলতে পারেনি। আর টুকিকে বলেই বা কী হতো? ভয় পেয়ে যেত হয়তো। টুকি মেয়েটা বেশ ভালো। মিলনের তো ভালোই লাগে ওকে। মাঝে মাঝে টুকির কাছে গিয়ে দুদণ্ড গল্প করতেও ভালো লাগে। ওকে খামোকা ভয় পাইয়ে দিয়ে কী লাভ? কাউকে ও বলেনি বটে— কিন্তু কী ঘটবে সেটা তো ও নিজেও এখনও ভেবে উঠতে পারেনি। আচ্ছা, কানু ঘোষের লোকেরা কি দলবল নিয়ে ওদের মারতে আসবে! কানু ঘোষের হাতে অনেক গুন্ডা আছে। বোমা-বন্দুক আছে— সব জানে মিলন। কানু ঘোষ সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে, সাদা স্করপিও চড়ে— দূর থেকে সেটাও দেখেছে মিলন। কানু ঘোষের লোকেরা যদি এসে মারে, কী করবে ওরা? সেদিন কে যেন বলছিল— দু-একদিনের ভিতর কানু ঘোষের লোকেরা গাছ কাটতে আসবে। গাছ কেটে রাস্তা চওড়া করবে। তখন চেনাই যাবে না ওদের গোয়ালপাড়া। কলকাতা থেকে সোজা গাড়ি এসে এ রাস্তা দিয়ে প্রান্তিকে ঢুকবে। কানু ঘোষের লোকেরা যদি এসে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়! বা গুলি চালায়! যদি গুলি লেগে মরে যাই, তাহলে কি লোকে শহিদ মিলন পাল বলবে? পারুল কি ওর বুকের ওপর আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদবে তখন— এইসব সাতপাঁচ ভাবতে থাকে মিলন। কিন্তু মিলনের মনে হয়— এ অঙ্ক তো অনেক সরল। কানু ঘোষের লোক আসবে আর গাছটা কেটে দেবে। গাছটাকে ওরা বাঁচাতে পারবে না। তা মিলন জানে। এই গাছ ঘিরে যারা বসে আছে তারাও এটা জানে। তবু ওরা বসে আছে। বসে আছে কেননা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বুড়ো বটকে ওরা আগলে রাখতে চায়। কিন্তু কানু ঘোষের লোকেরা আসবে কি আসবে না এ ভেবে যে খুব একটা ভয় করছে মিলনের এমনও নয়। কানু ঘোষ তো জানা বিপদ। প্রথম দিন থেকেই জানা। মিলনের মনে হলো— এমন একটা কিছু কাণ্ড ঘটে যাবে যেটা আগে থেকে ও জানেই না। বুঝতেই পারছে না। সেই অজানা ভয়ংকর কাণ্ডটাই ঘটে যাবে হয়তো খুব শীঘ্রই। কেন এমন মনে হচ্ছে কে জানে!

বুড়ো বটের ছায়ায় বসে এরকমই ভাবতে থাকে মিলন। আপম মনেই। আজ পাঁচ-ছদিন হলো ওরা সবাই পালা করে দিনে রাতে সবসময় এই বুড়ো বটকে ঘিরে গোল হয়ে বসে থাকছে। মিলন অবশ্য রাতে কোনোদিন থাকেনি। রাত হলেই ওর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। তবে সকাল হলেই এই ক'দিন এখানেই ছুটে আসছে মিলন। দুপুরে একটুক্ষণের জন্য খেতে বাড়িতে যাচ্ছে। তারপর আবার এখানে। রাত ন'টা বাজলে বাড়ি। মিলন জানে, ন'টার সিরিয়ালটা দেখে উঠে পারুল টেবিলে রাতের খাবার সাজাবে। এই ক'দিন মিলন গ্রিলের অর্ডার আনতে যায়নি কোথাও। সেটা পারুলও জানে। অবশ্য সে নিয়ে পারুল ওকে কোনোদিন জোর করেনি। এখন দেখতে দেখতে বেলা চড়ে গেছে। রোদ উঠেছে মাথার উপর। বুড়ো বটের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছে সবাই। কেউ কেউ মোবাইল দেখছে। একটু আগে ঝন্টু সবাইকে বিনি পয়সায় চা খাইয়েছে। বুড়ো বট ঘিরে যারা বসে থাকবে এই

ক'দিন দিনে দু-বার ঝন্টু তাদের বিনে পয়সায় চা খাওয়াবে বলেছে। এটা আমার কর্তব্য কিনা বলো— বলেছে ঝন্টু। এই বুড়ো বটের ডালে লাল সুতো বেঁধেই ঝন্টুর দোকানটা না এত বড় হলো। তা একটা কর্তব্য তো ঝন্টুর আছেই।

মিলনের মনে পড়ে যায়, টুকি সেদিন ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা বলছিল। এমন কোনো ঠাকুর দেবতার নাম মিলন আগে কখনো শোনেনি। টুকির কাছেই প্রথম শুনলো। আর টুকি যখন বলেছে, তখন আছে নিশ্চয়ই। সব ঠাকুর দেবতার নাম কি আর মিলনের জানা? নিজের অজান্তেই মিলন কপালে হাত ঠেকায়। টুকি বলেছিল, বুড়ো বটগাছটা নাকি কাটা পড়বে না। ইচ্ছে ঠাকরুন বাঁচিয়ে দেবেন। খুব যে একটা বিশ্বাস করেছিল মিলন— এমন নয়। আবার খুব একটা অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করছে না। যদি ইচ্ছে ঠাকরুন গাছটা বাঁচিয়ে দেন, তবে টুকির সঙ্গে গিয়ে ইচ্ছে ঠাকরুনের থানে একবার পুজো দিয়ে আসবে— ভাবে মিলন।

বেলা বেড়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরিয়েছে। এবার উঠতে হবে। পারুল এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্নান সেরে নিয়েছে। ওঠার তোড়জোড় করছিল, এমন সময় পাশে বসা নিবারণ বলে উঠল— বাড়ি যাচ্ছিস নাকি?

— ভাবছি যাব এবার। চান খাওয়াটা করে আসি।

— একটু পরে যাস। দু-মিনিট বস, তোর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। এতক্ষণ বিড়ি টানছিল নিবারণ। এবার বিড়িটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ডলতে ডলতে বললো। নিবারণের একটা সেলুন আছে গোয়ালপাড়ার মোড়ে।

— তা বসছি না হয়। যা বলার একটু তাড়াতাড়ি বল।

— রাস্তা তো চওড়া হবে। গাছটাও কেটে দেবে— বুঝেছিস নিশ্চয়।

— তা তো বুঝেছি।

— এসব আমরা আটকাতে পারব না। কানু ঘোষের হাত পড়েছে।

— তা তো পারবোই না।

— রাস্তা যখন চওড়া হবে আমাদের এসব দোকান ভেঙে দেবে, উঠিয়ে দেবে। আমাদের বলে গেছে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে।

— তোমাদের এখানে আর দোকান করতে দেবে না।

— হ্যাঁ রে, কানু ঘোষের লোকেরা কি মারবে আমাদের? তোর কী মনে হয়?

— প্রথমে মুখে বলবে। তারপর শুনতে না চাইলে মারবে।

— ওসব মারধরে আমার খুব ভয়। লাগবে আমার।

নিবারণ মুখ নামিয়ে কী ভাবতে থাকে। নিবারণকে দেখে একটু কষ্টই হয় মিলনের। নিবারণের দিকে তাকিয়ে বলে— তোমার কী খুব ভয় লাগছে নাকি!

— না, ভয় না, তবে এখন চিন্তা হয় খুব। দুটো মেয়ে আছে। সোমত্ত। বিয়ের বয়স হয়েছে। এখন এ দোকান তুলে দিলে কোথায় যাই বল তো?

মিলনের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। চুপ করে বসে থাকে মিলন। উত্তর দিক থেকে আসা হাওয়া হু-হু করে বয়ে যায়। সঙ্গে ধুলো আর শুকনো পাতা।

— তুই বেশ ভালো আছিস। মিলনের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন নিরাসক্ত ভাবেই বলে নিবারণ।

— আমার আবার কী দেখলে তুমি?

— এই যে কেমন গ্রিলের কারখানা করেছিস। কত বড়ো ব্যবসা। আমাদের মতো তো আর দোকান উঠে যাওয়ার চিন্তা নেই।

— ও আর আমি কী করলাম? ব্যবসা তো আমার বউ-ই সামলায়। ব্যবসার আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু ঘুরে বেড়াই। এধার-ওধার।

— তা বউটা তো তোর লক্ষ্মীমন্ত। তোকে চিন্তাই করতে দেয় না কিছু। আমাদের বউগুলো যদি ওরকম হতো...

— তা বলতে পারো লক্ষ্মীমন্ত। আমার তো যা কিছু সব বউয়ের জন্যই। শুধু এই একটা ব্যাপার... বউয়ের কোনো বাচ্চা হলো না...

— হলো না কেন? আর হবে না নাকি?

— কী জানি হলো না কেন। কত তো ডাক্তার দেখালাম, মানত করলাম।

— তা একদিক দিয়ে তুই কিন্তু বেঁচে গেছিস। আমার মতো যদি দুটো মেয়ে থাকতো তবে বুঝতি। মেয়ে দুটো সোমত্ত, তার ওপর আবার দোকানের পাট গুটোতে হবে। এ যে কী দুশ্চিন্তা, তা তুই বুঝবি না।

আবার নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে দু'জনের মাঝখানে। উত্তরের হাওয়া ধুলো আর শুকনো পাতা নিয়ে বুড়ো বটের চারপাশে পাক খায়। এই শীতের দুপুরে সে হাওয়ায় যেন কোথাও একটা বিষণ্ণতা মিলেমিশে যায়। নিবারণ আর একটা বিড়ি ধরায়। একটু বড়ো করে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর আপন মনেই যেন বলে ওঠে— গাছ কাটবে, রাস্তা বড়ো করবে। রাস্তার ধারের সব জমি প্লট প্লট করে বিক্রি হয়ে যাবে। আলো বসবে রাস্তায়। কলকাতা থেকে বাবুরা আসবে। বাড়ি বানাবে। কত আনন্দ করবে সে বাড়িতে। বিকেলে খোয়াইয়ের মাঠে সাঁওতালদের নাচ দেখতে যাবে। আচ্ছা, ওদের জন্য কি সেলুন

হবে এখানে? ওরা তো আমার সেলুনে আসবে না...

* * *

সেই সকাল থেকে ভেটকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে বুড়ো বটগাছের তলায় গোল হয়ে বসে থাকা লোকগুলোকে। এখন বেলা বেড়েছে। এর ভিতর অবশ্য দু-তিন কাপ চা খেয়ে নিয়েছে। সকালে একবাটি মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিল। আর কিছু খায়নি। এখন খিদেয় পেটটা মোচড় দিচ্ছে। মুখের ভিতর একটু টক টক জল জমেছে। একটু পরেই বাড়ি চলে যাবে। বউ আজ কী রান্না করেছে কে জানে! আজকাল বউয়ের মেজাজটা সবসময়ই তিরিক্ষে হয়ে থাকে। বাড়ি ঢুকলেই অশান্তি। বাড়িটাকে আজকাল একটু এড়িয়েই থাকতে চায় ভেটকি। খিদে পেলে বাড়ি ঢোকে, নয়তো ঢোকে না। এই ক'দিন সকাল থেকে এখানে এসে লোকগুলোর ওপর নজর রাখতে হয়েছে। কানু ঘোষের অর্ডার। তবে আজ শেষ। কাল থেকে আর আসতে হবে না। এমনিতেই কাল বিকেল থেকে অবশ্য ভেটকির মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে আছে। কাল সন্ধেবেলা, টুকির ঘর থেকে বেরনোর পর, খামোকাই কানু ঘোষ ওর হাতে তিনশোটা টাকা গুঁজে দিয়েছিল। বলেছিল— এটা তুই রাখ। কিছু কিনে নিয়ে যাস বাড়িতে। অবশ্য তারপরই পাছায় একটা লাথিও মেরেছিল। কানু ঘোষের মেজাজ ফুরফুরে থাকলে এরকম পাছায় লাথি মারে— সেটা ভেটকি জানে। এটা আদরের একটা ধরন। এক একজন, এক একরকম আদর করে— এই আর কী। কানুর আদরটা এরকমই। তবে, কারণে অকারণে কানু ওর হাতে টাকা গুঁজে দেয়— এটা অস্বীকার করতে পারে না ভেটকি।

বেলা বাড়ছে। খিদের চোটে এবার মাথাটাও ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। মুখের ভিতর জল জমছে। এবার বাড়ি ফিরতেই হবে। তার আগে যে কাজটা কানু ঘোষ দিয়েছে, সেটা শেষ করে ফেলাই ভালো। এরকম ভাবনা-চিন্তা করে ভেটকি পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বুড়ো বটের নীচে বসে থাকা জটলাটার দিকে। ওই জটলার কেউ যে ওকে ভালো চোখে দেখে না, বরং সন্দেহ করে, সেটা ভেটকি ভালোই জানে। ওই যে বটগাছের পাশে হোটেল চালায় যে ছেলেটা, ঝন্টু, ও ভেটকিকে কানু ঘোষের খোচর বলে ডাকে। সেটা ভেটকি একদিন শুনে ফেলেছিল। তবু পায়ে পায়ে ভেটকি জটলাটার দিকে এগোয়। কানু ঘোষ যেটা বলতে বলেছে, সেটা ওদের বলে ফেলতে পারলেই ছুটি। কাল থেকে আর এখানে আসতে হচ্ছে না।

গাছের তলায় বসেই মিলন লক্ষ্য করল, কানু ঘোষের লোকটা পায়ে পায়ে তাদের জটলার দিকেই আসছে। লোকটাকে মোটেই ভালো লাগে না মিলনের। কেমন যেন মরা মাছের মতো চোখ। থ্যাবড়ানো মুখ। এরকম মুখ মিলন কারও দেখেনি। লোকটাকে কেউই পছন্দ করে না। তবু লোকটা সর্বত্র ঘুরঘুর করে বেড়ায়। কানু ঘোষের চর। কানুর হয়ে খবর জোগাড় করে বেড়ায়। মিলন বাড়ির দিকে যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু এখন এই লোকটাকে এদিকে আসতে দেখে আবার বসে পড়ল। নিশ্চয়ই কোনো বাজে মতলব নিয়ে লোকটা আসছে এদিকে। হয়তো আজ থেকেই গাছ কাটবে— সেই কথাই বলতে আসছে।

পায়ে পায়ে জটলার কাছে এসে দাঁড়ায় ভেটকি। ওকে আসতে দেখে জটলার সবাই যে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে তা বুঝতেও পারে। জটলার মানুষগুলো এখন নিজেদের মধ্যে কথা থামিয়ে সরু চোখে ওকে জরিপ করছে। একটু অস্বস্তিই লাগে ভেটকির। এরকম উচ্ছুন্নে জীবন হলে এরকমই হয়। লোকে সন্দেহ করে। কী করে ও এদের বোঝাবে, আসলে উঞ্ছবৃত্তি করতে ওরও ভালো লাগে না।

মাটির দিকে চোখ নামায় ভেটকি। গলাটা যতটা সম্ভব নরম করে বলে— একটা কথা বলার ছিল।

জটলার ভিতর থেকে কে একটা গম্ভীর গলায় বলে— তা কী বলতে চাইছ, বলেই ফেল।

আর একজন তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে— কী আর বলবে? ওই তো কবে থেকে গাছ কাটবে বলতে এসেছে। তা বলো, বলো।

জটলার ভিতর থেকে এক বয়স্কা মহিলা অভিশম্পাত দেওয়াও শুরু করে— গুষ্টিশুদ্ধ সব মরবি তোরা। এ গাছ কাটলে গুষ্টিশুদ্ধ মরবি। সব ক'টা মরবি, সব কটা...

ভেটকি একটু থতমত খায়। তারপর— আজ্ঞে তা নয়। আমার কথাটা একটু শোনো তোমরা।

জটলার ভিতর থেকে গম্ভীর গলা আবার বলে উঠল— এত ভনিতা না করে আসল কথাটা কী বলতে এসেছ বলে ফেলো দিকি।

সামান্য কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ভেটকি বলে— বলছিলাম কী, মানে কানু ঘোষ বলতে বলেছে— এই গাছটা কাটা হবে না। আর নতুন রাস্তা অন্যদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। গাছটা থাকবে, কেমন। আমি চলি।

ভেটকির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসে গোটা চত্বর জুড়ে। কথাগুলো বলে ফেলেই ভেটকিও অন্যদিকে ফিরে হনহন করে হাঁটা লাগায়। হাঁটতে হাঁটতেই শুনতে পায় বুড়ো বট গাছের তলায় জটলা থেকে নৈঃশব্দ্য ভেঙে সমস্বরে একটা হো-হো শব্দ উঠেছে। বুঝতে

পারে, ওদের চোখে এখন আনন্দের কান্না। ওদের ভিতর কেউ কেউ বুড়ো বটের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করছে। না তাকিয়েও সব বুঝতে পারে ভেটকি। ভেটকিরও মনটা বেশ খুশি হয়ে ওঠে। আরে, উচ্ছুন্নে মানুষও কখনো কখনো ভালো খবর নিয়ে আসে— সে সবাই বুঝলে তো!

মরা মাছের মতো চোখের লোকটাকে এখন আর খুব একটা খারাপ লাগছে না মিলনের। বুড়ো বটের তলায় এখন একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরেছে। ঝন্টু ছুটেছে মিষ্টি আনতে। নিবারণ আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলল। গম্ভীর গলার লোকটা বলে উঠল— আজ সন্ধেবেলা এখানে কীর্তনের আসর বসবে। হরির লুঠ হবে। সবাইকে একটু খবর দিও হে।

মিলন মনে মনে ঠিক করে নিল, এখন আর বাড়ি ফেরা হবে না। এখন একবার টুকির কাছে যেতেই হবে। জেনে নিতে হবে ইচ্ছে ঠাকরুনের থানটা কোথায়।



।। দশ।।

বুড়ো বটের তলায় আজ সবাই কীর্তনের আসর বসিয়েছিল। আজ বড়ো আনন্দের দিন সবার। কানু ঘোষ জানিয়ে দিয়েছে বুড়ো বট কাটা হবে না। রাস্তাও অন্যদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বুড়োর কাছে গোটা ঘটনাটাই কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে। এরকমও হয় নাকি? সত্যিই কি অলৌকিক বলে কিছু আছে? কানু ঘোষ কেনই বা হঠাৎ গাছ কাটবে না বলে জানালো, কেনই বা রাস্তাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইছে— ভেবে কোনো তল পাচ্ছে না বুড়ো। দুপুরে খবরটা পাওয়ার পর থেকেই ভাবছিল। জিজ্ঞেসও করেছিল সবাইকে। কিন্তু কেউ সঠিক কারণটা বলতে পারল না। এখন আর কে-ই বা কারণ জানতে চায়। বুড়ো বট কাটা হবে না— এতেই সবাই খুশি। সন্ধেবেলা বুড়োও গিয়েছিল বুড়ো বটের তলায় কীর্তনের আসরে। গোয়ালপাড়ার লোকগুলোর ভিতর এখন খুশির জোয়ার নেমেছে। একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরছে। হাসিমুখে কথা বলছে সবাই। সন্ধেবেলা কীর্তনের আসরে গিয়ে বুড়ো দেখে, বুড়ো বটকে ঘিরে কী সুন্দর আলপনা দিয়েছে মেয়েরা। প্রদীপ জ্বালিয়েছে। বেশ একটা পুজো পুজো ভাব। ঝন্টু মাগনাতে সবাইকে চা খাওয়াচ্ছে আর বলছে— কী বলেছিলাম না বড় ঠাকুর বড় জাগ্রত। তার দয়াতেই তো সব হলো। কে একজন বলে গেল— ভাগ্যিস আমরা বুড়ো বটের তলায় হত্যে দিয়ে বসেছিলাম। তাতেই না হলো। বড়ঠাকুর শুনল তো আমাদের কথা! বসে বসে এই আনন্দটাই অনেকক্ষণ ধরে দেখল বুড়ো। বড়ঠাকুর আছে কি নেই তা বুড়ো জানে না, জানার খুব একটা যে ইচ্ছে আছে— এমনও নয়। এই মানুষগুলোর জীবনে এই যে আনন্দ এসেছে— এটাই বড় কথা।

কীর্তনের আসর থেকে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল আজ। বাড়ি ফিরে পুবদিকের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসেছিল। উঠে আর রাতের খাবার গরম করে খেতে ইচ্ছে করছিল না। একদিন রাতে না খেলে তেমন কিছু হবে না— ভাবলো বুড়ো। বরং, এখন এভাবে বারান্দায় বসে থাকতেই ভালো লাগছে। আজকাল রাতের দিকে মাঝেমধ্যেই বুড়ো এরকম বারান্দায় বসে থাকে। এরকম বসে থাকতে থাকতেই কখন ঘুম এসে যায় বোঝে না। অনেক ভোরে, যখন শিরিষ গাছের ডালে প্রথম পাখিটা ডেকে ওঠে— তখন ঘুম ভাঙে বুড়োর। আজকেও সেভাবেই ঘুমিয়ে পড়বে। আজ সকালে রতন একটা চন্দন গাছের চারা এনে দিয়েছে। কাল সকালে ওটা বাগানে লাগিয়ে দেবে। এই গাছটার একটা ভালো দেখে নাম দিতে হবে। সকাল থেকেই ভাবছে কী নাম দেবে। এখনও অবধি কোনো নাম মাথায় আসেনি। এক একটা নাম চিড়িক দিয়ে মাথায় উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো নামই সেরকম পছন্দ হচ্ছে না বুড়োর। আজ আর কোনো নামই মাথায় আসবে না। কাল সকালে যখন আলো ফুটবে, তখন গাছগুলোর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ঠিক একটা নাম মনে আসবে। আসবেই— জানে বুড়ো। রোজ ভোরবেলা যখন বাগানে অল্প অল্প করে আলো ছড়িয়ে পড়ে, ঘাসগুলো শিশিরে মাখামাখি হয়ে যায়, তখন বাগানে নামে বুড়ো। পরম মমতায় ওদের গায়ে হাত বোলায়। ওদের জড়িয়ে ধরে গাছের হৃদ্‌স্পন্দন শোনার চেষ্টা করে। এবং কী আশ্চর্য, শুনতেও পায়। গাছেরা ডালপালা দিয়ে ওকে আড়াল করে থাকে। গাছেদের নিয়ে এ সংসারটা বেশ ভালোই লাগে বুড়োর। এ সংসারে কোনো চাহিদা নেই, কোনো ঝগড়াও নেই। শুধু ভালোবাসা দিয়ে একে অপরকে কেমন জড়িয়ে থাকা।

রাত বেড়েছে। অবশ্য ওদের এই নতুন পল্লিতে সন্ধে সাতটার পরই মনে হয় অনেক রাত। বুড়ো অনেকদিন ঘড়ি ব্যবহার করে না। বাড়িতে কোনো ঘড়িও রাখেনি। আলোছায়ার লুকোচুরি দেখে বুড়ো সময় আন্দাজ করে। এখন

যেমন, প্রান্তিক স্টেশন দিয়ে গুমগুম করে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন চলে গেল। রোজই এসময়ে ট্রেনটা এখান দিয়ে যায়। এ ট্রেনটার যাওয়া শুনে বুড়ো আন্দাজ করতে পারে, এখন রাত সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি হবে। কোনো কোনো সময় অনেক রাতে কোনো মালগাড়ি এসে দাঁড়ায় স্টেশনে। তার ঘটাং ঘটাং এক অপার্থিব শব্দ ভেসে আসে। মনে হয় অনেক দূরের দেশের বার্তা বয়ে নিয়ে এলো বুঝি। তার চাকায় না জানি জড়িয়ে আছে কত দেশের ধুলো। কখনো কখনো দুপুরের দিকে বুড়ো গিয়ে বসে থাকে প্রান্তিক স্টেশনে। এসময় স্টেশনটা ফাঁকা থাকে। একটা-দুটো কুকুর শুধু গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে এদিক ওদিক। তখনও গুমগুম আওয়াজ তুলে মালগাড়ি ছুটে যেতে দেখেছে বুড়ো। তার একদম শেষের কামরায় একাকী এক গার্ড বসে। পাহাড়, অরণ্য, নদী পেরিয়ে কত দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই গার্ড, এমনই একা একা। কখনো কখনো ওই একাকী গার্ডটিকে দেখে হিংসা হয়েছে বুড়োর। মনে হয়েছে, সে-ও যদি কখনো মালগাড়ির গার্ড হতে পারতো।

এরকম প্রান্তিক স্টেশনে বসেই একদিন সে ঝড়ের রূপ দেখেছিল। প্রথমে আকাশের এক কোণে কালো এক চিলতে মেঘ করে এলো। তারপর নিমেষের ভিতরে সে মেঘ ছড়িয়ে গেল সারা আকাশ জুড়ে। ঘন কালো সে মেঘ। কী প্রলয়ংকর সে রূপ। আছাড়ি পিছাড়ি খেতে শুরু করল গাছগুলো। মনে হলো, যেন ধ্বংস করে তবেই শান্তি হবে। বুড়োর সর্বাঙ্গ ধুলোয় ঢেকে গেল। গায়ে উড়ে এসে পড়ল শুকনো পাতা। কোনো ভ্রূক্ষেপই করল না বুড়ো। অবাক হয়ে সে এক প্রলয়ংকরীর নাচন দেখতে লাগল দুচোখ ভরে। তারপর একসময় ঝড় থেমে গেল। শান্ত হলো চরাচর। পাখিরা ডেকে উঠল। শীতল হাওয়া ছুটে এলো কোথা থেকে। পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘ সরে গিয়ে কমলা রঙের এক অত্যাশ্চর্য আলো উঁকি দিল। মুগ্ধ করা সে রূপের দিকেও তাকিয়ে রইল বুড়ো।

পুবদিকের বারান্দায় বসে এসবই মনে করার চেষ্টা করছিল বুড়ো। বয়স তার নেহাত কম হলো না। তবে তাকে অবশ্য বয়সের আন্দাজে একটু বেশিই বুড়ো মনে হয়। সেটা হয়তো তার হাবভাবের জন্য। এই এতখানি বয়সে বুড়ো অবশ্য দু-চোখ ভরে দেখল অনেক। ও যা দেখল, তা অনেকেই দু-চোখ ভরে দেখতে পায় না। এই যেমন শিরিষ গাছের পাতার ওপর লেগে থাকা বর্ষার জলে রোদ্দুর পড়লে কী অপূর্ব এক কিরণ বিচ্ছুরিত হয়— তা কি কেউ দেখেছে? বুড়ো কিন্তু দেখেছে। বললে লোকে হাসবে। বলবে, এ একটা দেখার জিনিস হলো? কিন্তু বুড়ো জানে, এই জল আর রোদ্দুরের ভিতর কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। বা, রতনের মেয়ের কথাই ধরুক না কেন। গেলবার পৌষমেলা থেকে রতনের ক্লাস নাইনে পড়া মেয়েটার জন্য একটা গুলদস্তার মালা কিনে এনেছিল বুড়ো। মেয়েটাকে দিতেই তার কী আনন্দ। সারা মুখে যেন ঝাড়বাতির আলো জ্বলে উঠেছিল। এরকম আনন্দ দেখেছে কেউ কখনো? এ কি কখনো পয়সা খরচ করে দেখা যায়, না পয়সা খরচ করে দেখতে হয়? বুড়ো এইসব দেখেছে। এর জন্য বুড়োর নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। কারণ, বুড়ো বারবরই এসব দেখতে চেয়েছে। অন্যকিছু, বড় কিছু, বুড়ো দেখতে চায়নি কখনো। বুড়োর মাঝে মাঝে মনে হয়, শুধু ওর জন্যই বোধহয় ঈশ্বর এত ছোট ছোট আনন্দের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছেন ভুবনে।

আজ যখন কীর্তনের আসরে বসেছিল বুড়ো, তখন মিলন এসে ওর কানে কানে বলেছিল— ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা আপনি কিছু জানেন নাকি? মিলনকে বুড়োর বেশ লাগে। কোনো বিদ্বেষ, কোনো দুঃখ যেন এই লোকটাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই পৃথিবীতে লোকটা হিসাব রাখতে জানে না। সব হিসাবের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। নিজে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। বুড়ো জানে এইসব লোকেদের জন্যই ঈশ্বর চারদিকে এত আনন্দের সম্ভার সাজিয়ে রাখেন। সেসব এই লোকগুলোই শুধু দেখতে পায়, অন্য কেউ পায় না। কীর্তনের আসরে বসে মিলনের মুখে ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা শুনে বেশ মজা লেগেছিল বুড়োর।

— না বাপু, এরকম কোনো ঠাকরুনের কথা শুনিনি। তা তুমি শুনলে কোত্থেকে?

— মিলন ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলেছিল— আরে ছাই আমি কি জানতাম নাকি? আমাকে তো টুকিই বলেছে।

— তা টুকি জানল কোত্থেকে?

— সে আমাকে কিছুতেই বলেনি। আজ কত করে বললাম, টুকি আমাকে একবার ইচ্ছে ঠাকরুনের থানে নিয়ে চল, পুজো দিয়ে আসি। তা কিছুতেই রাজি হলো না। বলে, ওখানে সবার যেতে নেই। টুকির বড়ো জেদ কিনা। তাই আমি আর কিছু বলিনি।

— টুকি তোমাকে হঠাৎ ইচ্ছে ঠাকরুনের কথা বললো কেন?

— ওই যে সেদিন গেলাম না টুকির ওখানে। তা টুকিকে বলছিলাম, আমাদের বুড়ো বটটা এবার কেটে দেবে। শুনে টুকি বলল, কিছু হবে না। বুড়ো বট কেউ কাটতে পারবে না। বুড়ো বটকে ইচ্ছে ঠাকরুন রক্ষা করবেন। শেষ পর্যন্ত দেখুন সেটাই

হলো। হলো কিনা বলুন!

— হ্যাঁ। তা তো হলো বটেই। তা তোমার ইচ্ছে ঠাকরুনের থানটা কোথায়? একটু মজা করেই বলে বুড়ো।

— সে কি আমি জানি! সে তো টুকি জানে। আমাকে বলতে চায় না কিছুতেই।

একটু থামে মিলন। তারপর বুড়োর কাছ ঘেঁষে আসে। ফিসফিস করে বলে, আর একটা কথা বলি আপনাকে?

— বল।

— আজ না বাইকের পিছনে চাপিয়ে টুকিকে এখানে নিয়ে এসেছি। একটু পিছন দিকে তাকান। ওই দেখুন, একদম শেষে বাঁদিকে বসে আছে। আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে।

বুড়ো পিছনের দিকে তাকায়। শ্যামল স্নিগ্ধ চোখজোড়া পরম মমতায় তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওই চোখ আশ্রয় দিতে জানে।

— আপনাকে একদিন নিয়ে যাব টুকির কাছে। ডিম ভাত খাইয়ে আনব। রসুন দিয়ে ডিমের ঝোলটা টুকি খুব ভালো করে। একবার খেলে ভুলবেন না।

বুকের বাঁদিকে একটা ব্যথা খোঁচা দিয়ে উঠেই মিলিয়ে যায়। শরীরটাও একটু থিরথির করে কেঁপে ওঠে যেন। চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে বুড়ো। বড়ো তেষ্টা লাগছে আজ। বুকটা একদম শুকিয়ে কাঠ। জিভটা যেন ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসছে। একটু জল খেতে হবে। চেয়ারের হাতলে ভর রেখে বুড়ো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। আর তখনই আবার ব্যথাটা ফিরে আসে। দামামা বাজাতে শুরু করে বুকের ভিতর। গুমগুম আওয়াজ ওঠে যেন। যেন হাজার হাজার মালগাড়ি চলে যাচ্ছে বুকের ভিতর দিয়ে। থিরথির করে কাঁপতে থাকে বুড়োর শরীর। কেমন যেন আচ্ছন্ন লাগে নিজেকে। মাটিতেই শুয়ে পড়ে বুড়ো। চোখের সামনে সাদা পর্দার মতো কুয়াশায় ভেসে আসে কত ছবি। পশ্চিম আকাশ কালো করে আসা ঝড়, গোয়ালপাড়ার ফঙ্গবেনে মানুষটি, বুড়ো বটের তলায় সারি সারি প্রদীপের আলো, মাঝরাতে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একলা একটি মালগাড়ি— কত কী। মনে হয়, শিরীষ গাছটা তার দু-বাহু বাড়িয়ে যেন মুখে মাথায় আদর করে দিচ্ছে। নিজেকে মেঘের মতো হালকা লাগতে থাকে বুড়োর। মনে হয়, কেউ যেন তাকে অনেক দূরের দেশে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওই নক্ষত্র ছাড়িয়ে অন্য কোথাও। বুকের ভিতর গুমগুম শব্দ বাড়তে থাকে। গভীর ঘুম বুড়োকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। চোখ বুজে আসতে আসতেই বুড়ো ভাবে— চন্দন গাছটার নাম দেবে টুকি। বুকে হাত চেপে মাটিতেই শুয়ে পড়ে বুড়ো।

শিরীষ গাছের ডাল থেকে একটা রাতচরা পাখি অন্ধকারে উড়ে যেতে যেতে শুধুই ডেকে যায়— যাচ্ছি যাই, যাচ্ছি যাই, যাচ্ছি যাই...

* * *

পারুল আজ খুব সেজেছে। এরকম সাজতে পারুলকে কখনো দেখেনি মিলন। হ্যাঁ, সে বিয়ের দিন সেজেছিল বটে। লাল বেনারসি আর চন্দন পরেছিল। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল পারুলকে— মনে আছে মিলনের। তা বাদে পারুলকে খুব একটা সাজগোজ করতে দেখেনি। মাঝেমধ্যে, এদিক-ওদিক, নেমন্তন্ন বাড়ি গেলে টেলে একটু আধটু সাজে। তাও বেশি কিছু না। আজ যেন একটু বেশিই সেজেছে। নীল রঙের শাড়ি, তার সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ, এমনকী ঠোঁটে হালকা একটু লিপস্টিকও দিয়েছে। গলায় লকেট দেওয়া একটা সোনার হার। চার-পাঁচ বছর আগে হারটা পারুল পছন্দ করে বানিয়েছিল। মিলন আড়চোখে পারুলকে দেখে আর অবাক হয়ে যায়। কী যে আজ হলো পারুলের, কে জানে। এ যেন এক অচেনা পারুল। একে যেন মিলন কোনোদিন দেখেনি।

বুড়ো বটের তলায় কীর্তনের আসরে আজ কিছুটা রাতই হয়ে গিয়েছিল। কীর্তনের পর হরির লুঠ হলো। মিলনও হরির লুঠের বাতাসা কুড়িয়েছিল। পাঁচটা বাতাসা পেয়েছিল। তিনটে টুকিকে দিয়েছিল, দুটো নিজে খেয়েছিল। তারপর বাইকের পিছনে চাপিয়ে টুকিকে আবার আমোদপুর পৌঁছে দিয়ে আসে। বাইকের পিছনে বসে টুকি ওর কোমর জড়িয়ে রেখেছিল। খুব হাওয়া দিচ্ছিল। টুকির গায়ের গন্ধ ওর নাকে লাগছিল। মাঝে মাঝে ওকে একটু বেশি জড়িয়েই ধরছিল টুকি।

— কী রে এমন করিস কেন?

— উফ্ ঠাণ্ডা লাগছে না। আস্তে চালাও না কেন বাইকটা। রাতের আকাশে কত তারা। দুপাশের ধান খেতে ধান কাটা হয়ে গেছে। শিশিরে ভেজা খড় শুধু। সেই আকাশের নীচে কালো পিচের রাস্তা ধরে বাইক চালিয়ে টুকিকে আমোদপুরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল মিলন।

বাড়িতে ঢুকে পারুলকে দেখে একটু অবাকই হয়েছিল বটে। এত সেজেছে কেন পারুল? কোথাও গিয়েছিল কি? সে কথা অবশ্য পারুলকে জিজ্ঞাসা করেনি মিলন। জিজ্ঞাসা করাই যায়। তবু করেনি। কেন জানি না সঙ্কোচ হয়। শুধু আড়চোখে দেখছিল পারুলকে। শরীরটা একটু ভারি হয়েছে বটে, কিন্তু পারুল যে এখনও সুন্দরী আছে তা মানতেই হয়। এরকম বউ



পেলে যে কেউ বর্তে যেত, কিন্তু সব ছেড়ে ওর মন পড়ে রইল মাঠেঘাটে— নিজের সম্পর্কে নিজেরই খুব অবাক লাগে মিলনের। মিলন এও লক্ষ্য করেছিল দরজা খুলে দিয়ে পারুল কেমন লাস্যময় একটা হাসি হেসেছিল। এরকম হাসি অনেক বছর আগে হাসত পারুল। বিয়ের পর পর। আবার আজ রাতে এরকম হাসি ফিরিয়ে আনল কেন পারুল? অবাক হয়ে মিলন ভাবে।

খেতে বসেও লক্ষ্য করেছিল মিলন, পারুল যেন কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে। রোজ রাতের খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে পারুল চুপটি করে বসে থাকে। মিলন মাথা নীচু করে খায়, আর পারুল চুপচাপ তাকে লক্ষ্য করে। প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা কথা বলে না পারুল। মিলনের খাওয়া হয়ে গেলে সবকিছু গুছিয়ে শুতে যায় পারুল। এখনও ওরা এক ঘরে শোয় বটে, কিন্তু এক খাটে শোয় না। বহুদিন হলো পারুল বড় খাটটাকে বিদায় করে দুটো সিঙ্গল খাট এনেছে। কিন্তু আজ সবকিছুই অন্যরকম। লক্ষ্য করেছিল মিলন।

With Best Compliments:-

Luxmi Tea Co. Private Limited

Group Gardens :-

NARAYANPUR T. E.
SHYAMGURI T. E.
MONMOHINIPUR T. E.
MANOBAG T. E.
BHUYANKHAT T. E.
MANU VALLEY T. E.
GOLOKPUR T. E.
PEARACHERRA T. E.
JAGANNATHPUR T. E.
SAROJINI T. E.
FULBARI T. E.
URRUNABUND T. E.
MAKAIBARI T. E.
KENDUGURI T. E.
MORAN T. E.
SEPON T. E.
ATTABARIE T. E.
LEPTKATTA T. E.
ADDABARI T. E.
DIRAI T. E.
MAHAKALI T. E.

17, R. N. Mukherjee Road
Kishore Bhawan, Kolkata - 700 001
Phone No. 2248 4437 / 4227
Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com
Web. : www.luxmigroup.in

একটু যেন উচ্ছলতা পারুলের ভিতর। টেবিলের ওপর নখ দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে আপন মনেই গুনগুন করে কী যেন গাইছিল। ভাত খেতে খেতে মাঝে মাঝেই চোখ তুলে তাকিয়ে মিলন দেখেছিল, পারুল তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

— আর দুটো ভাত দিই?

— না, না, বেশি হয়ে যাবে।

— তাহলে মাছ নাও আর একটা।

— এখন থাক। একটা খেলাম তো।

— তোমার খাওয়া আজকাল বড্ড কমে গেছে। সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াও। অসুখ বিসুখ বাঁধিয়ে বোসো না যেন। আর শোনো, টাকা দেব, কাল দুটো জামা কিনে নিও। একই জামা পরে রোজ ঘুরে বেড়াও। ভালো লাগে না দেখতে।

খাওয়া শেষ করে এসেই মিলন শুয়ে পড়ে না। একজন বলেছিল, খাওয়ার পর অন্তত এক ঘণ্টা টান টান হয়ে বসে থাকতে হয়। তাহলে খাবার হজম হয়। তাই করে মিলন। খাওয়ার পর একঘণ্টা বিছানায় বসে থাকে। এই সময়টা পারুল ঘরে এসে বিছানার চাদর পরিষ্কার করে। তারপর শুয়ে পড়ে। শোয়ার আগে রোজই মিলনকে বলে— 'আলোটা কিন্তু নিভিয়ে দিও।' আজও মিলন খাওয়ার পর বিছানায় টান টান হয়ে বসেছিল। পারুল ঘরে এলো, কিন্তু বিছানার চাদর পরিষ্কার করল না। বরং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। মিলন এমনিতেই হিসেব বোঝে না। আজকের এই হিসেব কোনোভাবেই মেলাতে পারছিল না। পারুলের যে কী হয়েছে— সেটাই ভেবে কূল পাচ্ছিল না। কিন্তু কিছু একটা হয়েছে সেটা বুঝতে পারছিল। নয়তো এরকম পারুল করে না। পারুল অনেক শান্ত। দীঘির মতো। সেই দীঘিতে হঠাৎ ঢেউ উঠল কেন কে জানে?

আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখতে দেখতেই পারুল আচমকাই মিলনকে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, কানু ঘোষ বুড়ো বট কাটল না কেন? রাস্তাটাই বা ঘুরিয়ে দেবে বলল কেন হঠাৎ?

— কী জানি। কানুর হয়তো ইচ্ছে হয়েছে তাই।

— ধুস্, ইচ্ছে না ছাই। কিছু তো একটা কারণ আছে। নয়তো কানুর মতো একটা লোক এরকম করে!

— কেন করেছে তা আমি জানবো কেমন করে?

— এত ঘোরো চারদিকে, চোখ-কান খোলা রাখতে পারো না?

— রাখি তো, কিন্তু কিছু ধরা পড়ে না যে।

— সারাদিন যে কী ঘোরের ভিতর থাকো কে জানে।

কোনো উত্তর দেয় না মিলন। বসে থাকে চুপ করে। পারুল আরও কিছুক্ষণ আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখে। মুখ টিপে হাসেও যেন।

— এই শাড়িটায় কেমন লাগছে আমাকে বল তো?

— ভালোই তো। খারাপ কোথায়?

— এটা কোনো উত্তর হলো? আসলে তুমি ভালো করে দেখইনি।

— না, না, দেখেছি। বাড়িতে ঢুকেই তো দেখলাম।

— পাশের বাড়ির কমলের মা কলকাতা গিয়েছিল। ওকে দিয়ে কিনিয়ে এনেছি।

— ভালো করেছ।

— তোমার ভালো লেগেছে?

— হ্যাঁ।

এবার শব্দ করে হেসে ওঠে পারুল। হাসি থামলে বলে— বড়ো মন রেখে কথা বল তুমি।

মিলন কোনো উত্তর দেয় না। পারুল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে মিলনকে। তারপর বলে— বিকেল বেলা মিস্ত্রিরা বলছিল, বটগাছের ভিতরে যে বড়ঠাকুর থাকে সেই নাকি গাছটাকে রক্ষা করেছে।

— হ্যাঁ, গোয়ালপাড়ার লোকেরা তো তেমনই বলছে।

— বড়ঠাকুর কি খুব জাগ্রত?

— কী জানি। গোয়ালপাড়ার লোকেরা খুব মানত করে।

— হ্যাঁ, আজকে তো সবাই খুব ছুটে যাচ্ছে গাছের কাছে। মানত করার ধূম পড়েছে। মিস্ত্রিগুলোও গেল। লাল সুতো বাঁধবে।

— অনেকের মানত তো ফলে। ঝন্টুর যেমন। মানত করেই নাকি ঝন্টুর দোকান এতবড় হয়ে গেল। আজ বলে বেড়াচ্ছিল সবাইকে।

— আমিও আর একবার মানত করব। লাল সুতো বেঁধে আসব কাল।

আচমকাই একটা বিদ্যুৎ ঝলক দেখল মিলন। অনেকদিন পর সিল্কের শাড়ির খসখস শব্দ স্পর্শ করেছে ওর শরীরে। চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দ, পমেটমের গন্ধ— সব একাকার হয়ে আসছে। পারুল যেন এখন এক বাঘিনী। ঝাঁপিয়ে পড়েছে মিলনে ওপর। ভয়ে কিছুটা গুটিয়ে যায় মিলন।

— আমাদের এবার একটা খোকা হোক। মিলনের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে পরম আশ্লেষে বলে পারুল।

সাংঘাতিক একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে— ক'দিন ধরেই তা মিলনের মনে হচ্ছিল। পারুলের মুখটা নিজের বুকে চেপে

ধরে মিলন মনে মনে ভাবল— সাংঘাতিক কাণ্ডটা আজই বুঝি ঘটে যাবে।

* * *

দিন কাটে, মাস কাটে। ক্রমে ক্রমে শীত চলে যায়। বসন্ত আসে। কাল দোলপূর্ণিমা। স্কুল থেকে বেরিয়ে মাঠের ধার দিয়ে আসতে আসতে অরণ্য দেখল, বাচ্চারা চাঁচর সাজাচ্ছে। আজ রাতে চাঁচর পোড়াবে। এখন ঠাণ্ডাটা কমে এসেছে। তবু বিকেলের এই সময়টা ঠাণ্ডা পড়তে থাকে। এই ঠাণ্ডাটা বেশ ভালো লাগে অরণ্যর। এটা উপভোগ করার জন্যই স্কুল থেকে বেরিয়ে এই রাস্তাটুকু হাঁটে অরণ্য। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হাঁটে। সেই নতুন পল্লি অবধি। তারপর সাইকেলে ওঠে। পাশে দু-চারটে চেনাশোনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। অল্প কুশল বিনিময় হয়। এছাড়া নিজের মনেই পথ হাঁটে অরণ্য। নিজের মনে পথ হাঁটতে ওর ভালোই লাগে। কত কী ভাবতে ভাবতে হাঁটা যায়। কথা হলে তো সেসব ভাবনা আর আসে না মাথায়। তখন সব জট পাকিয়ে যায়। কাজেই রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে দু-একটা কথার পরই অরণ্য তাড়াতাড়ি নিজের পথে পা বাড়ায়। এতে লোকে ওকে কী ভাবলো, তা নিয়ে কিছু যায় আসে না অরণ্যর। ওর একলা ভাবনার মতো একটা সময় থাকতে হবে, সেটাও তো বুঝতে হবে সবাইকে।

হাঁটতে হাঁটতে নতুনপল্লির বাঁকটার মুখে এসে পড়ল অরণ্য। এখানে পাশাপাশি দুটো পলাশ গাছ রয়েছে। দুটো গাছেই ঝেঁপে ফুল এসেছে। কিছু ফুল মাটিতেও ঝরে পড়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পলাশ ফুলগুলো দেখে। মাটি থেকে দুটো ফুল কুড়িয়ে নিয়ে পকেটেও পোরে। কাল সকালে নতুনপল্লির মেয়েরা এই ফুল মাথায় গুঁজবে। কেউ বা আবার ফুল কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করবে কলকাতা থেকে দোল দেখতে আসা রমণীদের। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে পলাশ গাছ দুটোকে দেখে অরণ্য। তারপর আবার হাঁটা শুরু করে। এই বাঁকটা ঘুরলেই সেই বাড়িটা। বাড়িটা এখন শূন্য। ওই বারান্দায় রোজ বিকেলে এখন আর কেউ এসে দাঁড়ায় না। বাড়ির বাগানের গাছগুলো নিজেদের খেয়ালে বেড়ে উঠছে। নিজেদের খেয়ালেই বাগানে ফুল ফুটছে। বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা যেন নিজের খেয়ালেই এখনও বারান্দার ওপর ঝুঁকে পড়ে কার সঙ্গে কানে কানে কথা বলে। অরণ্য বাড়িটার সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়ায়। একবার তাকায় শূন্য বারান্দার দিকে। বুঝতে পারে, বাড়ির ভিতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বেড়ার ধারে বেড়ে ওঠা গুলঞ্চ গাছটায় হাত বোলায়। কার যেন স্পর্শ লেগে আছে এখানে। লোকটা একটু খ্যাপাটে ছিল ঠিকই। লোকটাকে রহস্যময় মনে হতো অরণ্যর। তবে লোকটা ভালো ছিল। কেন যে চলে গেল! কী তাড়া ছিল ওর? আসলে কিছু কিছু লোক এরকমই হয়। কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল— যাই। তারপরই হনহন করে রওনা দেয়। বুড়োটাও এরকমই ছিল— ভাবল অরণ্য।

আজকে আর হাঁটবে না। সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিল।

* * *

চায়ের দোকান খুলে বিকেল থেকে একাই বলেছিল সংঘমিত্রা। কাল দোল। আজ কলেজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। কলেজে ছেলেমেয়েরা আজ দোল খেলেছে। ইনুদি একটু আবির মাখিয়ে দিয়েছিল ওর গালে। বাড়িতে এসে মুখ ধুয়েছে। তবু হালকা আবিরের দাগ লেগেই রয়েছে। একটু পরেই সন্ধে হবে। আকাশে গোল চাঁদ উঠবে। পূর্ণিমার চাঁদ। সোনাঝুরি জঙ্গল ভেসে যাবে সেই আলোয়। সংঘমিত্রার ইচ্ছা হচ্ছে, তখন একটু হেঁটে আসবে সোনাঝুরির দিকে। সংঘমিত্রা চাইছে না আজ ওর দোকানে কোনো খদ্দের আসুক। আজ মনটা আনচান করছে। আজ কাউকে চা বিক্রি করতে ইচ্ছে করছে না।

রাস্তার দিকে গেটটা ঠেলে যে কেন ভিতরে ঢুকছে। শব্দ পেয়ে সংঘমিত্রা মুখ তুলে তাকালো। অরণ্য। সাইকেলটা গেটের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বাগান পেরিয়ে হেঁটে আসছে। সংঘমিত্রা আনমনেই নিজের কপালের চুলটা ঠিক করে নিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল একবার। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

দরজার কাছে এসে সংঘমিত্রাকে দেখে একটু হাসল অরণ্য। বললো— একটু চা খেতে এলাম।

— আজ তো চা হবে না।

— তাহলে আর কী? চলি...

— না, যাবেন না। আমি এখন সোনাঝুরির দিকে হাঁটতে যাব। আপনার সঙ্গে।

অরণ্য দেখল, একটা অত্যাশ্চর্য কমলা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। চরাচর ভেসে যাচ্ছে সেই আলোয়। বুড়োর বাড়ির জানালা থেকে এরকমই আলো ও দেখেছিল একদিন। বুড়ো বলেছিল, মানুষের জীবনে এই আলো দু-একবারই আসে। আর তখনই মনের ইচ্ছেটা মুখ ফুটে বলে ফেলতে হয়।

মনের ইচ্ছেটা আজ মুখ ফুটে বলে ফেলতেই হবে— ঠিক করে নেয় অরণ্য। ■

সন্ধ্যাবেলার কাব্য

মালিনী চট্টোপাধ্যায়



নবোদিত সূর্য পিয়াল গাছের আড়াল থেকে রত্নাকে দেখছে। যেদিনই এসময় গাছে জল দেয় রত্না, সূর্য দেখে। নতুন ফুল ফুটলে রত্নার খুব আনন্দ হয়। আজও দুটো লিলি, একরাশ দোপাটি আর নীল শালুক ফুটেছে। কিন্তু রত্নার মন কাল রাত থেকে ভালো নেই। একমাত্র সন্তান রনিত আর বৌমা গুঞ্জা এখন আমেরিকায়। চাকরি করছে। বহুদিন আসে না। গতমাসে রত্নার টাইফয়েড হয়েছিল। সে ফাল্গুনকে বলেছিল রণিতকে খবর দিও না। অকারণে চিন্তা করবে।

— বেশ। তুমি একটু সেরে ওঠো। তারপর খবর দেব।

সে একটু সেরে উঠতে রনিতকে খবর দিয়েছে ফাল্গুন।

সেদিনই সন্ধ্যায় রত্নার ফোন বেজে উঠেছে। ওপ্রান্তে রনিতের উদ্বিগ্ন স্বর— মা! এখন কেমন আছো?

সে বলেছে— ভালো! একবার দেশে আয়। যদি হঠাৎ মরে যাই তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

— যাঃ! মরবে কেন? তোমার কী-ই বা বয়স। এখনও ষাটও হয়নি।

— তাও আয়। কতদিন তোকে দেখি না।

— যাব। গুঞ্জাও তোমার জন্য চিন্তা করছে।

তারপর থেকে রত্না রনিতের জন্য

অপেক্ষা করেছেন। ফোনে শুধু বলেছে— চেষ্টা করছি, যাব।

ফুল গাছে জল দেওয়া হয়েছে। রত্না বাড়ির বাঁ প্রান্তে ফল বাগানের দিকে যান।

রনিতের ছেলেবেলার সঙ্গী রত্না। তার হাত ধরে ছোট ছোট পায়ে রনিত বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর সে হাত ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এতদূরে যে মায়ের অসুস্থতার খবরেও আর আসে না। মেজদি সেই কবে বলেছিল— বড় হলে ছেলে পর হয়ে যায়।

— আয়, আয়, আয়।

রত্না চোখ তুলে তাকাল। তার বাড়ির উল্টোদিকের একটা বাড়ির পর হলুদ রঙের বাড়িটা থেকে লগ্না বিড়ালকে ডাকছে। কালো কালো উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর ঠোঁট, ফরসা মুখে লালচে আভা। রত্না মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন। এক ছেলে আর এক মেয়ে লগ্নার। ওর ছেলে, মেয়ে কী সুন্দর ওর কাছেই রয়েছে।

পিছনে পায়ের শব্দ। রত্না ফিরে তাকান। ফাল্গুন।

ফাল্গুন বলে— গাছে জল দিচ্ছ কেন? আজ মিহির আসবে না?

রত্না গাছে জল দিতে দিতে বলে — না! ফোনে জানাল।

— আমাকে বললে না কেন? তুমি কি এত জল দিতে পারবে? আমাকে দাও। আমি দিচ্ছি।

ফাল্গুন ওর হাত থেকে পাইপটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়।

রত্না পাইপ দেয় না। বলে— কাজের মধ্যে থাকলে সব ভুলে থাকা যায়, জানো! কতদিন রনিতকে দেখি না।

ফাল্গুন নীচুগলায় বলে— ও এখন বড়ো হয়েছে। সংসার করছে। ওর নিজস্ব জীবন রয়েছে। ওকে ওর মতো থাকতে দাও। আমরা আমাদের মতো থাকি। কত আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। তুমি তো আগে গান শুনতে। নিজেও আপনমনে গান গাইতে। এখন আর গান করো না কেন?

— ও কাছে থাকলে, নয়তো মাঝে মাঝে ওর দেখা পেলে সব ভালো লাগে, বাগান করতে, গান শুনতে, রান্না করতে। নইলে আর কিছু ভালো লাগে না।

ফাল্গুন বলে— আমি বাজারে যাচ্ছি। বেশি পরিশ্রম করো না। বড়ো হলে সন্তান পর হয়ে যায়।

— সাবধানে যেও।

সামান্য পরে গাছে জল দেওয়া শেষ হয়। রত্না ঘরে আসে।

বেতের আসবাব। এক কোণে বাহারি টবে ইনডোর প্ল্যান্ট। দেওয়ালে রনিত আর গুঞ্জার বিয়ের ছবি।

রত্না লীলাকে বলে— লীলা, একটু চা কর।

— করছি মাসিমা।

তখনই কলিংবেল বেজে ওঠে। রত্না লীলাকে বলে— তুই চা কর। আমি দেখছি।

দরজা খুলে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। সামনে যে তরুণটি দাঁড়িয়ে সে আঠাশ বছর আগে রত্নার কোলে এসে রত্নার জীবনকে লাবণ্যে ভরিয়ে দিয়েছে। তার পাশে গুঞ্জা, সামান্য কিছুদিন আগে এসে যে রত্নার মেয়ে না হওয়ার দুঃখ ভুলিয়েছে।

রত্না হৈহৈ করে ওঠে— আজ আসবি জানাসনি তো। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। আয়, ঘরে আয়।

দুজনেই নীচু হয়ে তাকে প্রণাম করে। রনিত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে— ভেবেছিলাম তোমাদের সারপ্রাইজ দেব।

দু'জনে লাগেজ রেখে সোফায় বসে। রত্না ব্যস্ত হয়ে বলে— দাঁড়া তোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করছি। ছুটি পেলি তাহলে?

— ছুটি পাইনি মা, চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

বহুদিন পর এত আনন্দ হচ্ছে রত্নার। রনিতের যা রেজাল্ট নিশ্চয়ই এখানে কোনো ভালো চাকরি পেয়ে যাবে।

পরক্ষণেই রত্নার মন মেঘলা হয়ে গেল। অনেক টাকা মাইনে পেত। ওদের নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।

সে বলে— আমার জন্য চাকরি ছেড়ে দিলি? আমি তো সুস্থ হয়ে গেছি।

— তোমার জন্য তো বটেই, তাছাড়া দেশের কথাও খুব মনে হতো মা। আমেরিকা সুন্দর। কিন্তু এদেশের মতো সুন্দর দেশ কোথাও নেই।

রত্নার খুব ভালো লাগল। আমেরিকায় গিয়েও রনিত দেশকে ভোলেনি তাহলে!

সে বলে — দুপুরে কী খাবি বল দু'জনে?

রনিত হেসে বলে— মাছ। কতদিন গলদা চিংড়ির মালাইকারি খাই না।

গুঞ্জাও হাসে— মুড়িঘণ্টও অনেকদিন খাই না।

রত্না হাসতে হাসতে বলে— সব হবে, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, মুড়িঘণ্ট, দই মাছ, মাংস সব। আগে তোদের বাবাকে ফোন করি। বাজারে আছে, তারপর তোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করব।

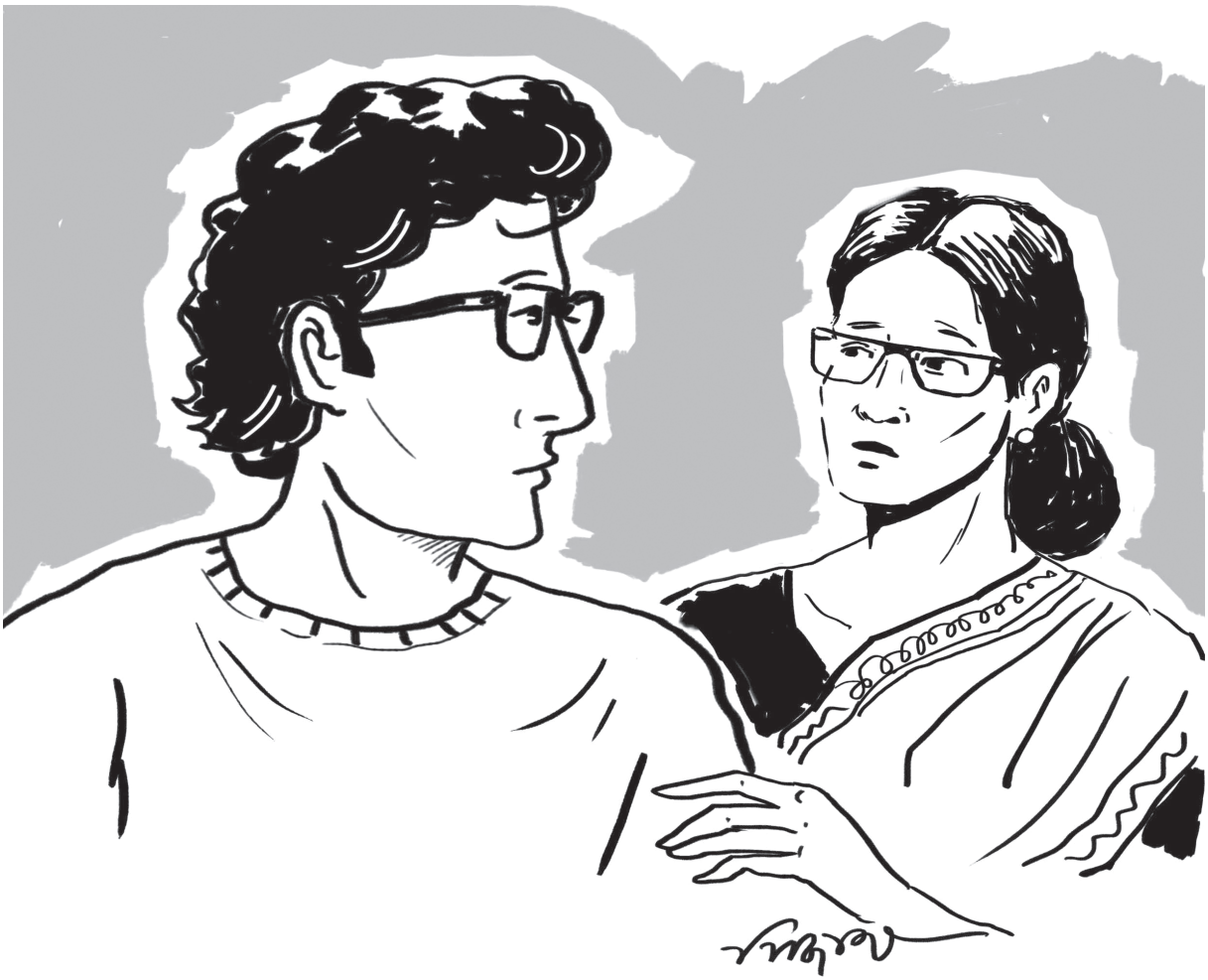
রত্না ফাল্গুনকে ফোন করেন। তারপর ব্যস্ত পায়ে রান্নাঘরে যায়।

বিকেলে লগ্না এলো— বৌদি, রনিত এসেছে?

— হ্যাঁ গো এসো!

লগ্না ব্যাগ থেকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার বার করে এগিয়ে দেয়। বলে— ও আজ গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। পুকুরের মাছ নিয়ে এসেছে।

রত্না হাসিমুখে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে



বলে— এসো, ঘরে এসো।

লগ্না ওর পিছু পিছু ঘরে আসে। রনিতকে বলে— রনিত, কতদিন থাকবে?

রনিত বলে— আর ওদেশে যাবো না বৌদি। এখানেই থাকব।

— খুব ভালো ডিসিশন নিয়েছ। মায়ের কত কষ্ট হয়।

চারজনে আড্ডা জমে ওঠে। চারজনের বয়সের ব্যবধান বিস্তর। কিন্তু মন সবার সমান রঙিন।

ফাল্গুনও এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

রনিত বলে— সিনেমাহলে কোনো ভালো ছবি এসেছে বৌদি? চলুন, সবাই মিলে দেখে আসি। কতদিন হলে গিয়ে ছবি দেখি না।

লগ্না বলে— টেনিদার একটা ভালো ছবি এসেছে তো গীতাঞ্জলিতে। 'কম্বল নিরুদ্দেশ'।

রত্না হৈহৈ করে ওঠে— কালকেই সবাই মিলে দেখতে যাব চলো।

রনিত বলে— কাল হবে না, মা। পরশু যাব। সায়কদাকেও বলবেন, বৌদি!

— বলব, তুমি এসেছ, আমরা যে কী খুশি হয়েছি।

রত্না হাসিমুখে বসে থাকে। লগ্নাকে, ওর ছেলেমেয়ে বরকে কত আপন মনে হচ্ছে রত্নার। শুধু ওরা নয়, সারা পাড়ার লোককে পরমাত্মীয় মনে হচ্ছে। নিজে সুখী হলে কী সবাইকে সুখী দেখতে ইচ্ছা করে? রত্না মনে মনে ঈশ্বরকে বলে— আমার জীবন সুখে ভরিয়ে দিয়েছ, সব সৎ লোককে সুখী কর ভগবান! বলেই ভাবে, ঈশ্বর তো চিরকাল তাই করেন। সৎ মানুষের চেয়ে সুখী আর কে আছে?

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে লগ্না চলে যায়।

রনিত বলে— মা, তোমাকে বলা হয়নি। কাল একবার কলকাতা যাব।

— কাল? কেন?

— একটা ইন্টারভিউ আছে, আরও কিছু কাজ আছে।

— কী কাজ?

— পরে বলব।

— রত্না ক্ষুব্ধ হয়ে বলে— আমাকে বলা যাবে না?

রনিত হাসে— তোমাকে বলা যাবে না, এমন কোনো কথা আছে?

— তবে?

রনিত সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে— আমেরিকায় এই ক'বছর অনেক টাকা রোজগার করেছি। আমি অনেক খেলনা, শাড়ি আর পোশাক কিনেছি। সামনে দুর্গাপুজো আসছে। তারপীঠের ভিখিরিদের অবস্থা দেখেছো? কিংবা কলকাতার? ওদের বুঝি শখ হয়



না, পুজোয় নতুন পোশাক পরার? ওদের বাচ্চাগুলোর কোনো খেলনা নেই। তাই ঠিক করেছি কাল কলকাতা গিয়ে আরও কিছু জামাকাপড় আর খেলনা কিনব। তারপর ওদের উপহার দেব।

রত্না কী বলবে ভেবে পায় না। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

গুঞ্জা বলে— আমি তোমার কাছে থাকব।

রনিত বলে— আমার কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছি। সকলেই প্রচুর উপার্জন করে। প্রত্যেকে যদি দুশো টাকা করেও দেয়, পুজোর সময় অনেক ভিক্ষাজীবীর মুখে হাসি ফুটবে। আরও অনেক পরিকল্পনা আছে আমার। আগে একটা চাকরি জোগাড় করি।

রত্নার খুব আনন্দ হচ্ছে। মনে মনে বলে— বড়ো হলে ছেলে পর হয় না ফাল্গুন। বন্ধু হয়ে ওঠে। এ ছেলে বিদেশে গিয়েও দেশকে ভোলেনি। মাকে ভোলেনি। দেশের ভিখিরিদেরও ভোলেনি।

বাগানে ফুল ফুটলে রত্নার আনন্দ হয়। কী সুন্দর দুটো ফুল ফুটেছে রত্নার জীবনে। ফুলের চেয়েও সুন্দর ওদের মন। অনাবিল সুখে রত্নার মন ভরে যাচ্ছে। ▮